ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

করোনা সংকট মোকাবেলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকা: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার
মো. শাহ্নূর রহমান
মো. শহিদুল ইসলাম

১৩ জানুয়ারি ২০২২

করোনা সংকট মোকাবেলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকা: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

গবেষণা উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি*
প্রফেসর ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি*
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, *পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা তত্ত্বাবধান, প্রতিবেদন সম্পাদনা ও পরিমার্জনা
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা দল
মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার, *রিসার্চ অ্যাসোসিয়েটস- কোয়ান্টিটেটিভ, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*
মো. শাহ্নূর রহমান, *রিসার্চ ফেলো (প্রাক্তণ), রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*
মো. শহিদুল ইসলাম, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার (প্রাক্তণ)- রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

প্রতিবেদন প্রকাশ: ১৩ জানুয়ারি ২০২২

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

কোভিড-১৯ অতিমারী বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মত বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা এবং সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে এক অভূতপূর্ব সংকটে ফেলেছে। করোনার বিস্তার মোকাবেলার জন্য আরোপিত সাধারণ ছুটি ও লকডাউন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা, ক্ষুদ্রঋণ কর্মকাণ্ড, সাধারণ কর্মজীবী ও খেটে খাওয়া মানুষের কর্মসংস্থানসহ সার্বিকভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে স্থবির ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। এই অতিমারীর সময়ে দেশের প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমেছে, বিশেষকরে ঝুঁকিগ্রস্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর করোনার নেতিবাচক প্রভাব ছিল বেশি। এই সংকট মোকাবেলায় ও মানবিক সহায়তায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তবে অতিমারীর প্রাথমিক পর্যায়ে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সরকারি নীতিকৌশল ও কর্মপন্থার সাথে কার্যকরভাবে যুক্ত না করারও অভিযোগ ওঠে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। এ প্রেক্ষিতে টিআইবি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যার অংশ হিসেবে বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রমে সুশাসনের চর্চা পর্যবেক্ষণ করে আসছে টিআইবি। এর ধারাবাহিকতায় করোনা সংকট মোকাবেলায় বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ ও অবদানের ব্যাপ্তি এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ ও শুদ্ধাচার চর্চা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে টিআইবি এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

গবেষণায় দেখা গেছে কোভিড-১৯ সংকট মোকাবিলায় সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অংশীজন হিসেবে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তহবিল ও চলমান প্রকল্পের তহবিল ছাড়াও সাধারণ তহবিল হতে ত্রাণ ও খাদ্য সহায়তা, নগদ অর্থ বিতরণ, সচেতনতামূলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্যসেবা ও সুরক্ষাসামগ্রী প্রদান, লাশ দাফন ও সৎকারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে সাড়া প্রদান করে। সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ হতে প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলো তুলনামূলক বেশি কার্যকর ছিল। নিয়মিত আয়ের উৎস না থাকা, দাতা সংস্থা কর্তৃক তহবিল হ্রাস এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হওয়ায় করোনা সংকট মোকাবেলায় কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংস্থাগুলোর তহবিল সংকট ছিল মূল চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে করোনার মতো সংকটের সময়েও ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়নে স্থানীয় ক্ষমতাশীলদের নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা গেছে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ বেসরকারি সংস্থার করোনা কর্মসূচি সংক্রান্ত তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয়ে তেমন কোনো অনিয়ম চিহ্নিত না হলেও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ঘাটতি ছিল। করোনাকালীন বিভিন্ন মেয়াদে ক্ষুদ্র ঋণের কিস্তি আদায় বন্ধ রাখার নির্দেশনা থাকলেও বেশ কিছু সংস্থার বিরুদ্ধে কিস্তি আদায়ে চাপ প্রয়োগের অভিযোগ পাওয়া যায়। করোনাকালীন প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়হীনতা দেখা গেলেও পরবর্তীতে স্বাস্থ্যসেবা, ত্রাণ বিতরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে সমন্বয়ের উন্নয়ন ঘটলেও বেসরকারি সংস্থা ও তদারকি সংস্থার অভিযোগ নিস্পত্তি ব্যবস্থায় ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থার উপকারভোগী, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, এনজিও কর্মী, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই গবেষণা সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার, এবং টিআইবি'র সাবেক কর্মী মো. শাহনূর রহমান ও মো. শহিদুল ইসলাম এবং বিশেষ সহায়তা করেছেন নিহার রঞ্জন রায়। টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। গবেষণার তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবেদন সম্পাদনা ও পরিমার্জন করেছেন সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম আকরাম। এছাড়া মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকগণ করোনা অতিমারী মোকাবিলায় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ এবং এই কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। গবেষণা প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

১. প্রথম অধ্যায় ৬
ভূমিকা ৬
১.১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ৬
১.২. গবেষণার জিজ্ঞাসা ৭
১.৩. গবেষণার উদ্দেশ্য ৭
১.৪. গবেষণা পরিধি ৭
১.৫. গবেষণা পদ্ধতি ৮
১.৬. তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ৮
১.৬.১. প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ৮
১.৬.১.১. প্রশ্নপত্র জরিপ ৮
১.৬.১.১.১. নমুনায়ন পদ্ধতি (বেসরকারি সংস্থা): ৮
১.৬.১.১.২. নমুনায়ন পদ্ধতি (উপকারভোগী): ৮
১.৬.১.২. মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ৯
১.৬.২. পরোক্ষ তথ্য ৯
১.৭. বিশ্লেষণ কাঠামো ১০
১.৮. গবেষণার সময়কাল ১০
১.৯. তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা ১০
১.১০. তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ ১০
১.১১. প্রতিবেদনের কাঠামো ১০
২. দ্বিতীয় অধ্যায় ১১
২.১. করোনা সংকট মোকাবেলায় বেসরকারি সংস্থাসমূহের উদ্যোগ ও অবদান ১১
২.১.১. বেসরকারি সংস্থাসমূহের উদ্যোগ গ্রহণের সময় ১১
২.১.২. বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ১১
২.১.২.১. সচেতনতামূলক কার্যক্রম: ১২
২.১.২.২. ত্রাণ ও খাদ্য সামগ্রী (প্যাকেজ) বিতরণ: ১৩
২.১.২.৩. সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ ১৫
২.১.২.৪. করোনা সংক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবা ১৬
২.১.২.৫. নগদ অর্থ সহায়তা ১৬
২.১.২.৬. লাশ দাফন বা সৎকার ১৭
২.১.২.৭. করোনা বিষয়ক গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম ১৮
২.১.২.৮. অভিবাসীদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম ১৯
২.১.২.৯. প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণ ১৯
২.১.৩. সরকারের অংশীজন হিসেবে ভূমিকা পালন ১৯
৩. তৃতীয় অধ্যায় ২১
৩.১. কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বেসরকারি সংস্থার সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ ২১
৩.২. কর্মসূচি বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ ২১

৩.২.১. তহবিল সংকট ২১
৩.২.২. উপকারভোগীদের তালিকা প্রণয়নে জটিলতা এবং ক্ষমতাশীলদের প্রভাবঃ ২৩
৩.২.৩. অন্যান্য চ্যালেঞ্জ ২৪
৪. চতুর্থ অধ্যায় ২৫
৪.১. তহবিল সংগ্রহ, ব্যয় ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে শুদ্ধাচার চর্চা ২৫
৪.২. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি ২৫
৪.৩. ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অনিয়ম ২৫
৫. পঞ্চম অধ্যায় ২৭
৫.১. তদারকি প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ২৭
৫.১.১. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ভূমিকা ২৭
৫.১.২. অন্যান্য তদারকি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ২৭
৫.১.৩. দাতা সংস্থার ভূমিকা ২৮
৫.২. করোনা সংকট মোকাবেলায় বেসরকারি সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয় ২৮
৬. ষষ্ঠ অধ্যায় ৩০
৬.১. উপসংহার ৩০
৬.২. সুপারিশঃ ৩০

১. প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

১.১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

২০১৯ সালের শেষের দিকে চীনে করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাব ঘটার পর দ্রুততার সাথে বিশ্বব্যাপী এর বিস্তার ঘটতে থাকে। আবির্ভাবের পাঁচ মাসের মধ্যেই বিশ্বের ১৮৫টি দেশের প্রায় ২ মিলিয়ন মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়[১] এবং বৈশ্বিকভাবে একটি মহামারির রূপ ধারণ করে। ১৯১৮ সালের স্প্যানিশ ফ্লু-এর পর এটি পঞ্চম বৈশ্বিক মহামারি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।[২] বর্তমানে বিশ্বের ২২২টি দেশ ও অঞ্চলে এই ভাইরাসের বিস্তার ঘটেছে। বিশ্বের অন্যান্য বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাস প্রকট প্রভাব বিস্তার করেছে। ২০২০ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কোভিড আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হওয়ার পর থেকে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে শুরু করে। উপরন্তু করোনার বিস্তার মোকাবেলার জন্য গৃহীত নন-থেরাপিউটিক কৌশল হিসেবে আরোপিত সাধারণ ছুটি ও লকডাউন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা, ক্ষুদ্রঋণ কর্মকাণ্ড, সাধারণ কর্মজীবী ও খেটে খাওয়া মানুষের কর্মসংস্থানসহ সার্বিকভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা স্থবির ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে।[৩]

কোভিড-১৯ গোটা বিশ্বকে সার্বিকভাবে প্রভাবিত করেছে। জাতিসংঘের মতে, গত ৭৫ বছরে বিশ্ব এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি। কোভিড ১৯ এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এতটাই প্রকট যে বিশ্বের শক্তিশালী অর্থনীতিগুলো এখনো এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে লড়াই করছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বরং দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল জনবহুল একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশে এই মহামারির কারণে সৃষ্ট ক্ষতির অনুপাত আরও মারাত্মক। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) প্রকাশিত এক গবেষণাপত্র অনুসারে, কোভিড-১৯ মহামারির ফলে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্ভাবনা ৭৭ বিলিয়ন ডলার থেকে ৩৪৭ বিলিয়ন ডলার যেখানে এই মহামারি চলাকালীন সময়ে এশিয়ার দেশগুলি প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলার লোকসানের সম্মুখীন হতে পারে।[৪] ২০১৯ সালে যেখানে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.২ শতাংশ, ২০২০ সালে এসে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩.৮ শতাংশে।[৫] করোনাকালীন এক বছরে দেশের প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষের জীবনমান নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমেছে। ঝুকিগ্রস্থ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন অতি দরিদ্র, প্রতিবন্ধী, নারী, উদ্বাস্তু, বস্তি ও দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের ক্ষেত্রে করোনার নেতিবাচক প্রভাব ছিল বেশি।[৬]

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (২০২০) এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ তার জিডিপি থেকে প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার হারাবে এবং করোনার কারণে প্রায় ৯ মিলিয়ন মানুষ চাকরি হারাবে।[৭] এছাড়া করোনাকালে ১৩ শতাংশ বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ২৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।[৮]

১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে বিশেষকরে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর প্রধান কাজ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির ত্রাণ ও পুনর্বাসনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা।একসময় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ কমে এলে এসব সংস্থার অনেকগুলিই গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য দানের কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসে। এভাবেই দেশে উন্নয়নে অংশীদারিত্বের একটি নতুন ধারা সৃষ্টি হয়।[৯] বিগত সময়েও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ও মানবিক সহায়তায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ অনুসারে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে দুর্যোগ মোকাবেলা ও প্রস্তুতিতে সরকারের সহায়ক শক্তি বা অংশীজন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত কার্যক্রমের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। তা সত্ত্বেও করোনা সংকটের প্রাথমিক পর্যায়ে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সরকারি নীতিকৌশল ও কর্মপন্থার সাথে কার্যকরভাবে যুক্ত না করার অভিযোগ ওঠে।

---

[১] Dong E, Du H, Gardner L. An interactive web-based dashboard to track COVID-19 in real time. *Lancet Infect Dis.* (2020). doi: 10.1016/S1473-3099(20)30120-1)

[২] Liu YC, Kuo RL, Shih SR. COVID-19: The first documented coronavirus pandemic in history. Biomedical journal. 2020 Aug 1;43(4):328-33.

[৩] Islam K, Ali S, Akanda SZ, Rahman S, Kamruzzaman AH, Pavel SA, Baki J. COVID-19 Pandemic and Level of Responses in Bangladesh. Int J Rare Dis Disord. 2020;3:019.

[৪] https://bids.org.bd/uploads/publication/BUS/BUS38/06_Jahan_%20Economy%20&%20COVID%2019.pdf

[৫] Nordea Trade (2021), "The Economic Context of Bangladesh [Online]-Economic and Political Overview - Nordea Trade Portal" [Accessed on 06/04/2021

[৬] BRAC COVID-19 Yearbook 2020

[৭] Begum, M., M. S. Farid, S. Barua and M. J. Alam (2020), "COVID-19 and Bangladesh: Socio-Economic Analysis towards the Future Correspondence".

[৮] *যুগান্তর*, ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত, 'করোনাকালের নয়া মহামারি 'বাল্যবিবাহ' ',৩১ জুলাই ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: লিংক

[৯] বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, সালেহউদ্দিন আহমেদ, বাংলাপিডিয়া [accessed on: 2 November,2021]

তবে উদ্ভূত এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক স্ব স্ব অবস্থান হতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়। সংকট মোকাবেলার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে জানুয়ারিতে (২০২০) জাতীয় পর্যায়ের কয়েকটি এনজিও নিজ উদ্যোগে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। পরবর্তীতে মার্চের (২০২০) শুরু থেকে এই সংকট মোকাবেলায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও এনজিওসমূহের একাংশ বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করে। এসকল উদ্যোগ ও কার্যক্রমের মধ্যে জনসচেতনতা তৈরি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ, খাদ্য সহায়তা, সুরক্ষা সরঞ্জামাদি বিতরণ, নগদ অর্থ সহায়তা, করোনা আক্রান্ত মৃত ব্যক্তিদের লাশ দাফন/সৎকার এবং পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে করোনা সংকটের শুরুর দিকে এনজিওসমূহের যথাযথ ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন মহল হতে প্রশ্ন উঠেছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন সমালোচনামূলক মন্তব্য ও অভিযোগ (যেমন, এনজিওসমূহের নিষ্ক্রিয়তা, ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি আদায়ে তাগাদা, স্বাস্থ্যবিধি না মেনে ত্রাণ বিতরণ ইত্যাদি) গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য সরকারি খাত/প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি খাত/প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চা নিশ্চিত করা। এ উদ্দেশ্যে টিআইবি বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ইতিপূর্বে টিআইবি'র বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জরুরি পরিস্থিতিতে সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত হয়েছে।

করোনা সংকট মোকাবেলায় বিভিন্ন খাত ও ইস্যুভিত্তিক গবেষণা পরিচালিত হলেও সুনির্দিষ্টভাবে বেসরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে গবেষণার অপ্রতুলতা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে করোনা সংকট মোকাবেলায় বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ ও অবদানের ব্যাপ্তি এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ ও শুদ্ধাচার চর্চা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে টিআইবি এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

১.২. গবেষণার জিজ্ঞাসা

করোনা পরিস্থিতিতে বেসরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকা পর্যালোচনার জন্য নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো এই গবেষণায় বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

১. করোনা সংকট মোকাবেলায় বেসরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহের ধরন ও কাজের ব্যাপ্তি কিরূপ ছিল?
২. করোনা সংকট মোকাবেলায় বেসরকারি সংস্থাসমূহ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কী ধরনের চ্যালেঞ্জের (প্রতিবন্ধকতা, সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি) সম্মুখীন হচ্ছে/হয়েছে?
৩. করোনা সংকট মোকাবেলায় বেসরকারি সংস্থাসমূহের কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে, তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সুশাসনের আলোকে (স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ ও সমন্বয়, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ) কী ধরনের চ্যালেঞ্জ ছিল?
৪. তদারকি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার ভূমিকা কী ছিল?

১.৩. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য করোনা সংকট মোকাবেলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহেরর ভূমিকা ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা। এ গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো -

১. করোনা সংকট মোকাবেলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহের উদ্যোগ ও অবদান পর্যালোচনা করা;
২. করোনা সংকট মোকাবেলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহের কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা;
৩. করোনা সংকট মোকাবেলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে শুদ্ধাচার পর্যালোচনা করা;
৪. গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে করণীয় নির্ধারণে সুপারিশ প্রদান করা।

১.৪. গবেষণা পরিধি

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সমাজসেবা অধিদপ্তর, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) ও সরকারের অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক নিবন্ধিত কেবলমাত্র করোনা সংকট মোকাবেলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহ এই গবেষণার আওতাভুক্ত। ব্যক্তি মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান করোনা সংকটকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখলেও উক্ত গবেষণার আওতায় তাদেরকে রাখা হয়নি। এছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গবেষণার আওতাভুক্ত।

- সংস্থাগুলোর সাড়া প্রদানের ধরন ও কাজের ব্যাপ্তি এবং এবং কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ
- সহযোগী অংশীজন হিসেবে সরকারের করোনাকালীন বিভিন্ন কর্মসূচিতে অবদান ও ভূমিকা পালন

- করোনা সংকটকালে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার উপকারভোগীদের অভিজ্ঞতা
- কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়
- করোনা সংকট মোকাবেলায় বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে শুদ্ধাচার চর্চা
- তদারকি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা।

১.৫. গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। গুণবাচক ও পরিমাণবাচক উভয় পদ্ধতিই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে এ প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে।

১.৬. তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্যের উৎস ও তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি নিচে উল্লেখ করা হলো:

১.৬.১. প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

১.৬.১.১. প্রশ্নপত্র জরিপ

করোনা পরিস্থিতিতে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা পর্যবেক্ষণের জন্য নির্বাচিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের প্রধান নির্বাহী বা সংশ্লিষ্ট অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং উপকারভোগীদের উপর দুটি পৃথক জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। নিম্নে এই দুটি জরিপের নমুনায়ন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো:

১.৬.১.১.১. নমুনায়ন পদ্ধতি (বেসরকারি সংস্থা):

এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন তদারকি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিবন্ধিত যেসব বেসরকারি সংস্থা করোনা সংকটকালে সাড়া প্রদান করেছে তাদেরকে সমগ্রক (Population) হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বেসরকারি সংস্থা নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুই পর্যায়বিশিষ্ট স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথম ধাপে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জসহ ৪৪টি জেলা নির্বাচন করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে নির্বাচিত জেলাগুলোতে কার্যক্রম পরিচালনকারী আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং স্থানীয় সংস্থাগুলোকে দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে।

সুবিধাজনক নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসারে নমুনা আকার নির্ধারন করা হয় ৫০ অর্থাৎ কমপক্ষে ৫০টি সংস্থার তথ্য সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করা হয়। নমুনায়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং স্থানীয় সংস্থার প্রতিনিধিত্বমূলক সংখ্যা নিশ্চিত করার জন্য শুরুতে নির্বাচিত ৪৪টি জেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এমন ৫৬৮টি সংস্থাকে উল্লিখিত ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়।

এরপর প্রতিটি ভাগ হতে ১৭.৬% {(১০০/৫৬৮)*'১০০=১৭.৬} সংস্থা দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়। এতে ৭টি আন্তর্জাতিক, ১৯টি জাতীয় এবং ৭৪টি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ের সংস্থার প্রতিনিধিত্বমূলক সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ওভার সেমপ্লিং এবং আন্ডার সেমপ্লিং পদ্ধতি অনুসরণ করে ১০টি আন্তর্জাতিক, ৩৫টি জাতীয় এবং ৭২টি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। এভাবে নির্বাচিত মোট ১১৭টি প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্নপত্র প্রেরণ করা হয়। তার মধ্যে ৭৪টি (৯টি আন্তর্জাতিক, ২৩টি জাতীয় এবং ৪২টি স্থানীয়) প্রতিষ্ঠান তা পূরণ করে ফেরত পাঠায়।

উল্লেখ্য যে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র অনুযায়ী একটি গুগল ফর্ম তৈরি করে নির্বাচিত বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের কাছে অনলাইনে প্রেরন করা হয়।

১.৬.১.১.২. নমুনায়ন পদ্ধতি (উপকারভোগী):

উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ অনুযায়ী বেসরকারি সংস্থা হতে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোকে এই গবেষণায় আওতাভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত জরিপে সারা দেশ থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক ১৫,৮৪০টি খানা নির্বাচন করা হয়। এর মধ্যে সর্বমোট ৬,২৮১টি খানার সদস্যরা বেসরকারি সংস্থা হতে কোনো না কোনো ধরনের সেবা গ্রহণ করেছিল।

প্রাথমিকভাবে উপকারভোগী জরিপের জন্য নমুনার আকার ৫০০ নির্ধারণ করা হয় অর্থাৎ কমপক্ষে ৫০০টি খানা হতে একজন করে উপকারভোগীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু, পরবর্তীতে নন রেসপন্স বিবেচনায় (সদস্যের অনুপস্থিতি, জরিপে অংশগ্রহণে অনাগ্রহ, ফোন নাম্বারের অপ্রাপ্যতা) নমুনা সংখ্যা আরও ২৫০ বৃদ্ধি করে সর্বমোট ৭৫০ জন উপকারভোগীকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য নির্ধারণ করা হয়। চূড়ান্তভাবে ৫৮৯ জন উপকারভোগী জরিপে অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রথম ধাপে সকল উপকারভোগী খানাকে বিভাগ অনুযায়ী বিন্যাস করা হয়। প্রতিটা বিভাগের উপকারভোগী খানা সংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী বিভাগভিত্তিক নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়, অর্থাৎ এক্ষেত্রে নমুনায়নের জন্য পিপিএস নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। পরবর্তীতে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে সকল বিভাগের শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলের খানার সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। উক্ত নমুনা বিন্যাসকে নিম্নোক্ত টেবিলে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ১: উপকারভোগীর নমুনা বিন্যাস

বিভাগ	অঞ্চল	খানা	বিভাগভিত্তিক অনুপাত (পিপিএস)	বিভাগভিত্তিক নমুনার আকার	অঞ্চল ভিত্তিক অনুপাত (জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭)	অঞ্চল ভিত্তিক খানার সংখ্যা
বরিশাল	গ্রাম	৩৩৭	০.৮৩০	৬৩	০.৬৪	৪০
	শহর	১৯০			০.৩৬	২৩
চট্টগ্রাম	গ্রাম	৬২০	০.১৫১	১১৩	০.৬৫	৭৪
	শহর	৩৩০			০.৩৫	৩৯
ঢাকা	গ্রাম	৮৪৩	০.১৮৬	১৪০	০.৭২	১০১
	শহর	৩২৯			০.২৮	৩৯
ময়মনসিংহ	গ্রাম	২৯৪	০.০৫৮	৪৪	০.৮১	৩৫
	শহর	৭১			০.১৯	৮
খুলনা	গ্রাম	৫৩৭	০.১৪০	১০৬	০.৬৮	৭১
	শহর	২৮৭			০.৩২	৩৪
রাজশাহী	গ্রাম	৬৬১	০.১৫২	১১৪	০.৬৯	৭৯
	শহর	২৯৬			০.৩১	৩৫
ওংপুর	গ্রাম	৬২৭	০.১৫৩	১১৫	০.৬৫	৭৫
	শহর	৩৩৭			০.৩৫	৪০
সিলেট	গ্রাম	৩০২	০.০৭৩	৫৫	০.৬৫	৩৬
	শহর	১৬০			০.৩৫	১৯
মোট		**৬২৮১**		**৭৫০**		**৭৫০**

সর্বশেষ নিয়মতান্ত্রিক দৈবচয়ন পদ্ধতি (Systematic random sampling) ব্যবহার করে প্রতিটি বিভাগ হতে নির্দিষ্ট সংখ্যক খানা নির্বাচন করা হয়। এরপর নির্বাচিত খানাসমূহের খানা প্রধানের সাথে যোগাযোগ করে প্রতিটি খানা হতে একজন উপকারভোগীকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়।

উল্লেখ্য টেলিফোনের মাধ্যমে উপকারভোগীকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এবং তা এন্ট্রির জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম (Kobo collect) ব্যবহার করা হয়।

১.৬.১.২. মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

করোনা সংকট মোকাবেলায় বেসরকারি সংস্থার সাড়া প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম, বেসরকারি সংস্থাসমূহের উদ্যোগ ও তাদের অবদান, সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা, স্বাস্থ্যসেবা, সুরক্ষা সরমঞ্জামাদি (মাস্ক, সাবান, স্যানিটাইজার, পিপিই ইত্যাদি) বিতরণ, ত্রাণ বিতরণ, নগদ অর্থ-সহায়তা প্রদান, কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেসরকারি সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়, করোনা সংকট মোকাবেলায় বেসরকারি সংস্থার তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয়ে শুদ্ধাচার এবং তদারকি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে ও প্রয়োজনীয় মতামত নেয়ার জন্য মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার জন্য একটি চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়। মুখ্য তথ্যদাতাদের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, নির্বাচিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের প্রধান নির্বাহী বা সংশ্লিষ্ট অন্য কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজ প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট গবেষক উল্লেখযোগ্য।

১.৬.২. পরোক্ষ তথ্য

প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন ও গবেষণা নিবন্ধ, গবেষণাভুক্ত সংস্থা কর্তৃক নিজ নিজ ওয়েবসাইট-এ প্রকাশিত করোনা সংকট মোকাবেলায় কর্মসূচির ধরন ও বাস্তবায়ন, তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৭. বিশ্লেষণ কাঠামো

যেহেতু এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে শুদ্ধাচার পর্যালোচনা করা। এক্ষেত্রে শুদ্ধাচারের নিম্নোক্ত চারটি নির্দেশকের ওপর ভিত্তি করে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে :

সারণি ২: শুদ্ধাচারের নির্দেশক

শুদ্ধাচারের নির্দেশক	অন্তর্ভুক্ত বিষয়
স্বচ্ছতা	উপকারভোগী নির্বাচন ও তালিকা প্রণয়ন, সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান ও ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যের উন্মুক্ততা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ
জবাবদিহিতা	তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা, বেসরকারি সংস্থা ও তদারকি প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিযোগ ও সংক্ষুব্ধি ব্যবস্থাপনা
অংশগ্রহণ ও সমন্বয়	কার্যক্রম বাস্তবায়নে (আর্থিক সহায়তা প্রদান, সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান ও ত্রাণ বিতরণ) সমন্বয়, সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয়
দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ	উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়ন, ত্রাণ ও নগদ অর্থ বিতরণ

১.৮. গবেষণার সময়কাল

২০২০ সালের জুলাই থেকে ২০২১ সালের ডিসেম্বর সময়ে গবেষণার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। গবেষণার অংশ হিসেবে উপকারভোগীর জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয় ১-১০ ডিসেম্বর ২০২০ এবং বেসরকারি সংস্থার জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয় ২৫ নভেম্বর হতে ২০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে।

১.৯. তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা

তথ্য সংগ্রহের জন্য KoBoToolBox App-এর মাধ্যমে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে স্মার্ট ফোনের সাহায্যে প্রশ্নপত্র পূরণ করা হয়। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করার কারণে একদিকে যেমন উপাত্তের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অপরদিকে মানসম্মত উপাত্তও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া জরিপের বৈজ্ঞানিক মান নিশ্চিত করতে জরিপ বিষয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন বিশেষজ্ঞের সার্বিক সহায়তা ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি গবেষণার ধারণাপত্র প্রস্তুত হতে শুরু করে ফলাফল উপস্থাপনা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে সক্রিয় পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

১.১০. তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

এ গবেষণায় সেবাগ্রহীতা জরিপের তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের মূল কাজ ছিল পূরণকৃত প্রশ্নমালার বিভিন্ন অসামঞ্জস্য দূর করা। এক্ষেত্রে তথ্যদাতাদের সাথে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে টেলিফোনে কথা বলে তথ্য যাচাই করা হয়েছে। এরপর Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) সফটওয়্যার ব্যবহার করে জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মূলত বিভিন্ন সূচক ও চলকের শতকরা হার ও গড় নির্ণয় করা হয়েছে।

১.১১. প্রতিবেদনের কাঠামো

গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা, গবেষণার জিজ্ঞাসা, যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, পরিধি, পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, বিশ্লেষণ কাঠামো, গবেষণার সময়কাল, প্রতিবেদনের কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে করোনা সংকট মোকাবেলায় বেসরকারি সংস্থাসমূহের উদ্যোগ গ্রহণের সময়, সাড়া প্রদানের ধরন ও বিভিন্ন কার্যক্রমের (সচেতনতামূলক কার্যক্রম, খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ, স্বাস্থ্য সেবা ও হাসপাতাল সংক্রান্ত কার্যক্রম, নগদ অর্থ সহায়তা, লাশ দাফন বা সৎকার, করোনা বিষয়ক গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম, অভিবাসীদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম, প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণ) ব্যাপ্তিসহ সরকারের অংশীজন হিসেবে ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বেসরকারি সংস্থাসমূহের সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ যথা তহবিল সংকট, উপকারভোগীদের তালিকা প্রণয়নে জটিলতা এবং ক্ষমতাশীলদের প্রভাবসহ অন্যান্য চ্যালেঞ্জ আলোচিত হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে।

তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয়ে শুদ্ধাচার, বেসরকারি সংস্থা ও তদারকি প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিযোগ ও সংক্ষুব্ধি ব্যবস্থাপনা, তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয়ে স্বচ্ছতা, উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়ন, ত্রাণ ও নগদ অর্থ বিতরণ শুদ্ধাচার, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অনিয়ম আলোচিত হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। পঞ্চম অধ্যায়ে তদারকি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাসহ করোনা সংকট মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি

প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপসংহারসহ গবেষণার আলোকে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

২. দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১. করোনা সংকট মোকাবেলায় বেসরকারি সংস্থাসমূহের উদ্যোগ ও অবদান

বিগত সময়ে যে কোনো দুর্যোগে সরকারের সহায়ক অংশীজন হিসেবে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতির ন্যায় করোনা মহামারি মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার নানাবিধ উদ্যোগ ও কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়েছে।

২.১.১. বেসরকারি সংস্থাসমূহের উদ্যোগ গ্রহণের সময়

বাংলাদেশে ২০২০ সালের ৮ মার্চ প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হওয়ার সময় থেকেই মূলত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার নানা ধরনের উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সংস্থাসমূহের দুই তৃতীয়াংশ এর বেশি (৭৭.৫%) প্রতিষ্ঠান প্রথম তিন মাসের মধ্যে (মার্চ'২০-মে'২০) কোভিড-১৯ সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু করে (চিত্র ১)। তবে করোনা সংকট মোকাবেলার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ২০২০ সালের জানুয়ারিতেই জাতীয় পর্যায়ের কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা নিজ উদ্যোগে প্রস্তুতি ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে।[১০] জরিপে অংশগ্রহণকারী জাতীয় পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠানও ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তাদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম শুরু করে।

চিত্র ১: বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগ গ্রহণের সময়ের বিন্যাস

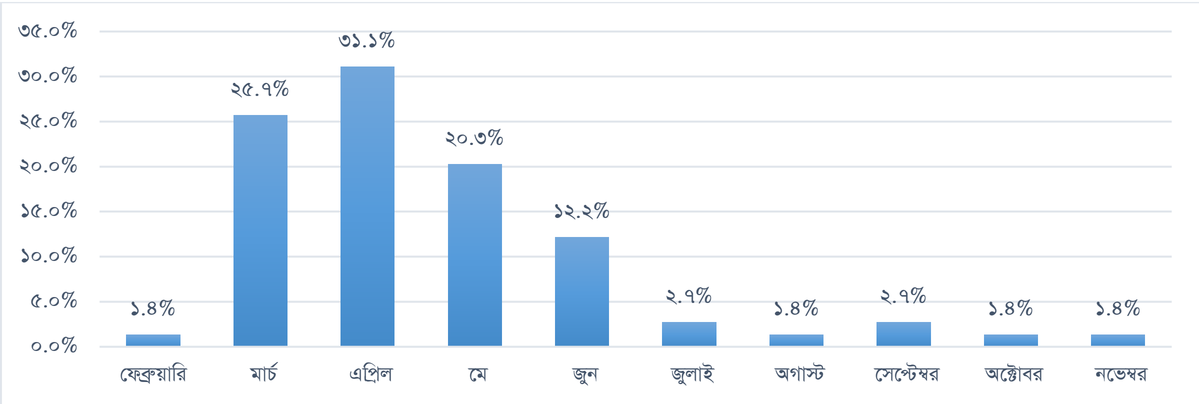

যেসব প্রতিষ্ঠান তুলনামূলকভাবে দেরিতে (জুন'২০-নভেম্বর'২০) কাজ শুরু করেছিল তাদের প্রায় ৮২ শতাংশই (১৬টি) ছিল স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান এবং প্রায় প্রত্যেকেই কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তহবিল সংগ্রহ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিল।

২.১.২. বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

করোনা সংকট মোকাবেলায় বেসরকারি সংস্থাসমূহ যে ধরনের উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তার মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরামর্শ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, খাদ্য সহায়তা, সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ, ত্রাণ সহায়তা, করোনা আক্রান্ত মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন/সৎকার, নগদ অর্থ সহায়তা, পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রায় সবগুলো প্রতিষ্ঠানই করোনা সংকট মোকাবেলায় উপরোল্লিখিত কোনো না কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর মধ্যে ৯৭.৩ শতাংশ সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। এছাড়া ৮৩.৮ শতাংশ প্রতিষ্ঠান সুরক্ষা সামগ্রী ও ত্রাণ প্যাকেজ বিতরণ করে (চিত্র ২)। এছাড়াও ৫০ শতাংশেরও অধিক প্রতিষ্ঠান নগদ অর্থ সহায়তা ও খাদ্য বিতরণ করে। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান (৩৫ শতাংশ) করোনা সংক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবাও প্রদান করে।

[১০] ২০২০ সালের জানুয়ারিতে প্রাথমিক প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ব্রাক ও সাজেদা ফাউন্ডেশন কাজ করে।

চিত্র ২: বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের বিন্যাস

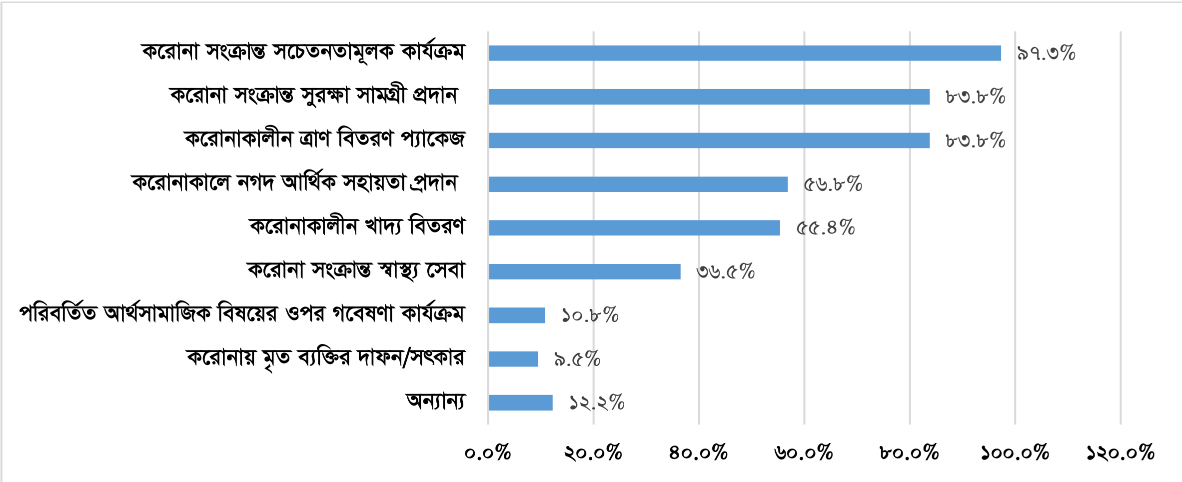

২.১.২.১. সচেতনতামূলক কার্যক্রম:

সংকটকালীন সময়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে, যার মধ্যে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা, সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা, মাস্ক পরা, নিয়মিত ও সঠিক উপায়ে হাত ধোয়া, যথাযথভাবে লকডাউন ও হোম কোয়ারেন্টাইন মেনে চলা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা উল্লেখযোগ্য। সামাজিক সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে এসব সংস্থা সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ, মাইকিং, পোস্টার ও ব্যানার টানানো ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সঠিক নিয়মে হাত ধোয়া বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং নিরাপদ দূরত্ব মেনে চলা বিষয়ক ক্যাম্পেইনের মত কার্যক্রমেও সম্পৃক্ত হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশ, টক শো সম্প্রচার, পোস্ট শেয়ারের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে একজন সমাজসেবা কর্মকর্তা বলেন,

> *"বেসরকারি সংস্থাগুলো আমাদেরকে বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করেছে, বিশেষকরে সচেতনতা সৃষ্টি এবং লকডাউন ও হোম কোয়ারেন্টাইন মেনে চলার বিষয়ে। কেউ বিদেশ থেকে আসলে, কিংবা কেউ করোনায় আক্রান্ত হলে সে বা তারা নিয়ম কানুন মেনে চলছে কিনা সে ব্যাপারে বেসরকারি সংস্থাগুলো আমাদেরকে আপডেট জানিয়েছে"।*

নিম্নে কয়েকটি সংস্থার কিছু উল্লেখযোগ্য সচেতনতামূলক কর্মসূচির বিবরণ দেয়া হল:

সারণি ৩: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য সচেতনতামূলক কর্মসূচির বিবরণ

প্রতিষ্ঠান	সচেতনতামূলক কর্মসূচি
ব্র্যাক	৭.৮ কোটি মানুষকে ইন-হাউস প্রশিক্ষণের মাধ্যমে করোনা প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে সচেতনতামূলক সেবা বা ওরিয়েন্টেশন প্রদান[১১]
	৮৫টি উপজেলায় ফার্মাসিস্টদের মাঝে ৩২০০০ কপি করোনা সংক্রান্ত বিশেষ গাইডলাইন বিতরণ[১১]
	ঈদ-উল-আযহায় স্বাস্থ্য সচেনতামূলক মাইকিং ও বিভিন্ন গার্মেন্টসে ব্যানার টানানো[১১]
	টিকা বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে ৫০টি জাতীয় পত্রিকায় তিনটি থিমেটিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে ১০টি টকশো ও ২৫৯টি পোস্ট সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করা[১২]
আরডিআরএস বাংলাদেশ	প্রায় ৩৮,৩৩,০৯১ টাকা ব্যয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় কমিউনিটি রেডিওতে স্বাস্থ্য ও সরকারি বিভিন্ন নির্দেশনা বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার[১৩]

[১১] BRAC COVID-19 Yearbook 2020

[১২] COVID-19 Situation Update (Sep 2), available at: https://www.brac.net/covid19/res/sitrep/BRAC-COVID-19-Situation-Update_Bangladesh_Sept-6.pdf [accessed on 05 November,2021]

[১৩] আরডিআরএস হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে

প্রতিষ্ঠান	সচেতনতামূলক কর্মসূচি
কারিতাস বাংলাদেশ	৪৩টি জেলার ২২৬,৪০৩ বাড়ির প্রায় ১১,৩১,৭৬৫ মানুষের কাছে সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছানো[১৪]
এস কে এস ফাউন্ডেশন	৫২০০০ লিফলেট বিতরণ, ৫৫০টি ফেস্টুন, ২০টি রোমান ব্যানার ও দুইটি বিলবোর্ড প্রদর্শন[১৫]
	স্থানীয় কমিউনিটি রেডিও ও দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে সচেতসতামূলক বার্তা পৌঁছানো[১৫]
এছাড়া করোনা সংকটের শুরুতেই ব্র্যাক বাংলাদেশ ২২ লক্ষ, আশা ২০ লক্ষ, টিএমএসএস ৮ লক্ষ, গণ উন্নয়ন কেন্দ্র ১.৫ লক্ষ ও আইসিসিও কর্পোরেশন ৫০ হাজার সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করে[১৬]	

করোনাকালীন সময়ে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম স্থগিত থাকার কারণে অনেক সংস্থা তাদের কর্মীদের এই সময় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে।[১৭]

চিত্র ৩: উপকারভোগীদের মতে বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত সচেতনতামূলক কার্যক্রমের বিন্যাস

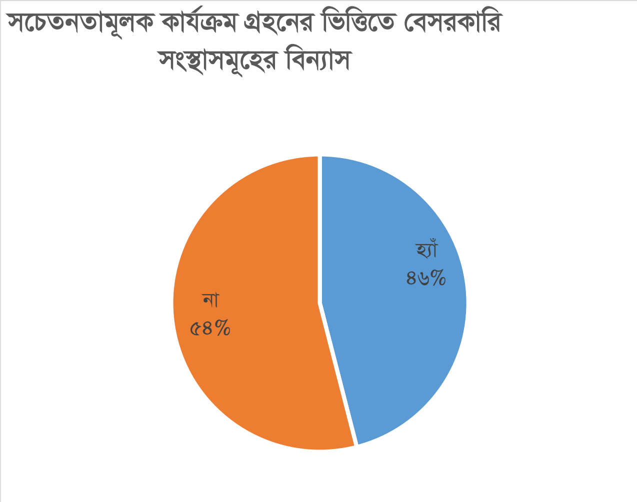

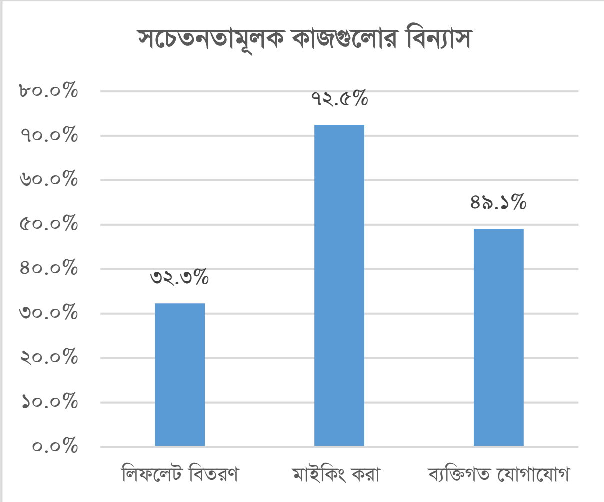

চিত্র ৩ থেকে দেখা যাচ্ছে, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত উপকারভোগীদের ৪৬% এর বসবাসরত এলাকায় কোনো না কোনো এনজিও বা বেসরকারি সংস্থা কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ করেছিল। যাদের এলাকায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল তাদের ৭২.৫% বলেছেন যে তাদের এলাকায় সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাইকিং করা হয়েছে এবং ৪৯.১% বলেছেন যে বেসরকারি সংস্থাগুলো তাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সচেতনতা চেষ্টা করেছে। এছাড়া ৩২.৩% বলেছেন যে তাদের এলাকায় সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

২.১.২.২.ত্রাণ ও খাদ্য সামগ্রী (প্যাকেজ) বিতরণ:

করোনাকালীন সময়ে লকডাউন এবং বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রসমূহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে এই সময়ে অনেক মানুষেরই কর্মসংস্থান তথা সর্বোপরী আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায়। কর্মহীনতার কারণে অনেক মানুষই তখন খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হন। করোনাকালীন সময়ে সৃষ্ট এই খাদ্য সংকট মোকাবেলার জন্য তখন সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা প্রয়োজনী খাদ্য সামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং এ বিষয়ক নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এই সময় অভাবী মানুষদের মাঝে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী, যেমন চাল, ডাল, পেঁয়াজ, চিনি, লবন, তেল, দুধ, সেমাই ইত্যাদি বিতরণ করে খাদ্য সহায়তা প্রদান করে।

সংকট মোকাবেলায় কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থা হতে খাদ্য সামগ্রী প্রদানের পাশাপাশি ত্রাণ প্যাকেজও বিতরণ করা হয়েছে। ত্রাণ প্যাকেজের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী, সুরক্ষা সামগ্রীসহ ক্ষেত্রবিশেষে নগদ অর্থও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ত্রাণ প্যাকেজ বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সহায়তা নিয়ে তালিকা

[১৪]Caritas Bangladesh Response to COVID-19 Pandemic, Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh, available at: https://bdplatform4sdgs.net/caritas-bangladesh-response-to-covid-19-pandemic/ [accessed on 05 November,2021]
[১৫] এসকেএস এর ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, বিস্তারিত দেখুন https://www.sks-bd.org/index.php/covid-19-update [পরিদর্শনের সময়: ১ নভেম্বর ২০২১]
[১৬] করোনা যুদ্ধে এনজিও ফেডারেশন (এফএনবি),১১ আগস্ট ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: লিংক [পরিদর্শনের সময় : ১৫ জুলাই ২০২১]
[১৭] *প্রাগুক্ত*।

প্রণয়ন করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা নিজ উদ্যোগে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে আবার কখনো কখনো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করে সেগুলো মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে[৩]। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী একজন সমাজসেবা কর্মকর্তা বলেন,

> *"আমরা একটা সমন্বিত তালিকার কথা বলেছিলাম। ত্রাণগুলো সমাজসেবা অধিদপ্তরে জমা দিয়ে বিতরণের প্রস্তাব ছিলো। পরে প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই বিতরণ করেছে। কারণ আমরা আসলে সময় করতে পারিনি। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো লোকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দিয়ে এসেছে।"*

করোনা পরিস্থিতিতে খাদ্য সংকট মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং স্থানীয় পর্যায়ের সংস্থাও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী একজন সরকারি কর্মকর্তার তথ্য অনুযায়ী পটুয়াখালীর পায়রা ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন কোনো সরকারি অনুদান না পেলেও তারা নিজেদের উদ্যোগে টাকা সংগ্রহ করে প্রতিবন্ধীদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করে। এছাড়া রুরাল এনহ্যান্সমেন্ট অরগানাইজেশন ত্রাণ সরবরাহের পাশাপাশি প্রশাসনের সাথেও কাজ করেছে।

নিম্নে আরও কয়েকটি সংস্থার উল্লেখযোগ্য খাদ্য ও ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ দেওয়া হল:

সারণি ৪: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য খাদ্য ও ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ

প্রতিষ্ঠান	খাদ্য ও ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচি
ব্র্যাক	২৫,৩৪০টি পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে যার মধ্যে ছিল অতি দরিদ্র পরিবার, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তি, যৌনকর্মী, আদিবাসী, বয়স্ক নাগরিক ইত্যাদি[১৮]
ব্যুরো বাংলাদেশ	৫১,৬১৭ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৫.১০ কোটি টাকার খাদ্যসামগ্রী বিতরণ[১৯]
আশা	১,৫৪,৬৭০ টি পরিবারের মধ্যে ১১.৫২ কোটি টাকা মূল্যমানের ২,৪৭৫ মেট্রিক টন খাদ্য বিতরণ[২০]
গণ উন্নয়ন কেন্দ্র	ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন ৮,৫৪১ পরিবারকে ত্রাণ সহায়তা[২১]
সাজেদা ফাউন্ডেশন	ঢাকা শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২,৭৯৮ জনকে ৩,৩৫,৭৬০ টাকা ব্যয়ে তৈরি খাবার সহ[২২] ৩,১৬,২৩২ জনকে খাদ্য সহায়তা প্রদান[২৩]
আরডিআরএস বাংলাদেশ	২১,৩৩,৮৯৭ টাকা ব্যয়ে ৬,২৩,৫৪৬ পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ[২৪]
বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন	'এক টাকার আহার' কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন ১০০০০-১৫০০০০ বাক্স এবং সর্বমোট প্রায় ১ কোটি বাক্স খাদ্য বিতরণ[২৫]
আইসিসিও কর্পোরেশন	২৮০ জন তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিসহ ৩,৪৫০ বাড়িতে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ[২৬]
এএলআরডি	ভূমিহীন, দলিত ও আদিবাসী প্রায় ৩,০০০ পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ[২৭]

[১৮] BRAC COVID-19 Yearbook 2020
[১৯] করোনা যুদ্ধে এনজিও ফেডারেশন (এফএনবি), *প্রাগুক্ত*।
[২০] *প্রাগুক্ত*।
[২১] গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) এর ত্রাণ তৎপরতা ও সচেতনতামূলক প্রচারনা, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্লাটফর্ম, বাংলাদেশ, ১১ আগস্ট ২০২০,বিস্তারিত দেখুন: লিংক [পরিদর্শনের সময়: ২ নভেম্বর ২০২১]
[২২] করোনা যুদ্ধে এনজিও ফেডারেশন (এফএনবি), *প্রাগুক্ত*।
[২৩] COVID-19 Response Activities of SAJIDA Foundation – As of December 15th, 2021, available at: https://sajidafoundation.org/covid-portal/coronavirus-covid-19/
[২৪] আরডিআরএস হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে।
[২৫] এক টাকায় আহার, বিস্তারিত দেখুন: https://onetakameal.org/ [পরিদর্শনের সময়: ৩ নভেম্বের ২০২১]
[২৬] ICCO's role during COVID-19, Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh, available at: https://bdplatform4sdgs.net/iccos-role-during-covid-19/ [accessed on 1 November 2021]
[২৭] ALRD Response to COVID-19, Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh, available at: https://bdplatform4sdgs.net/alrd-response-to-covid-19/ [accessed on 20 October 2021]

২.১.২.৩.সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ

করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সচেতনতার পাশাপাশি সুরক্ষা সামগ্রীর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শুরুর দিকে ডাক্তারদের সুরক্ষা সামগ্রীর সংকট বড় আকার ধারণ করে। বিভিন্ন জায়গা থেকে সুরক্ষা সামগ্রীর অভাবে ডাক্তারদের চিকিৎসা না দিতে পারার অভিযোগ সোশ্যাল মিডিয়াসহ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এছাড়া জরুরি প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়া, কর্মজীবীদের কর্মক্ষেত্রে যাওয়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুরক্ষা সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক হয়ে উঠে। তবে পরবর্তীতে পিপিইসহ অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও করোনাকালীন সময়ে সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করে। সুরক্ষা সামগ্রীর মধ্যে পিপিই, মাস্ক ও হ্যান্ড সেনিটাইজার বিতরণ, ডিজইনফেক্টিভ চেম্বার স্থাপন, হাত ধোয়ার পয়েন্ট স্থাপন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উদাহারণস্বরূপ প্রায় ৩৫ হাজার ব্র্যাকের সম্মুখসারির কর্মীরা সারাদেশে এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ মাস্ক বিতরণ করে। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ফার্মেসি বিভাগের সহায়তায় ব্র্যাক ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ লক্ষ সুরক্ষা সামগ্রী উৎপাদন করে। এছাড়া তাদের নিজস্ব ফ্যাসিলিটিগুলোতে প্রায় এক লক্ষের বেশি হাত ধোয়ার পয়েন্ট স্থাপন করে।[২৮]

নিম্নে আরও কিছু প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ দেওয়া হল:

সারণি ৫: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ

প্রতিষ্ঠান	সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি
ব্যুরো বাংলাদেশ	করোনা সংকটের শুরতে চিকিৎসক ও নার্সদের জন্য ২০০টি এন ৯৫ মাস্ক ও ১০০ সেট পিপিই প্রদান[২৯]
সাজেদা ফাউন্ডেশন[৩০]	২১টি জেলার ১,২৫০ পরিবারের মধ্যে ১,৬২,৫০০ টাকার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী (সাবান, স্যানিটাইজার) ও মাস্ক বিতরণ
	চিকিৎসকদের জন্য ২,৮৭,৬০,২০০ টাকা ব্যয়ে ২০,৫৪৩ সেট ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) প্রদান
	২৪,২০,০০০ টাকা ব্যয়ে ৪৮৪টি ভ্রাম্যমান হাত ধোয়ার কেন্দ্র স্থাপন
	তৈরি পোষাক কারখানায় ৫১,২৪০ টাকা ব্যয়ে ২৮৯টি ঢাকনাযুক্ত ডাস্টবিন স্থাপন
টিএমএসএস	১০ টন ব্লিচিং পাউডার দ্বারা কমিউনিটিতে ডিজইনফেকশন করা এবং ১০ লক্ষ মাস্ক এবং ৫ হাজার হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ[৩১]
সেভ দ্য চিলড্রেন	১,৯৩,১৭২ সংখ্যক বাড়িতে নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাসহ হাত ধোয়া সামগ্রী প্রদান[৩২]
কারিতাস বাংলাদেশ	৫,৩২০ হাত ধোয়ার সামগ্রী, ৮৭৫ হ্যান্ড গ্লাভস, ২১৯৮ মাস্ক, ৩৭৪ বোতল হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং ২০ সেট পিপিই প্রদান[৩৩]
আরডিআরএস বাংলাদেশ	৪৫,৫৫৮ পরিবারের মধ্যে ৩৭,৬৩,২৮৭ টাকা মূল্যমানের সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান[৩৪]
গণ উন্নয়ন কেন্দ্র	২৪টি হাত ধোয়ার কেন্দ্র স্থাপন[৩৫]

স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন সিটি করপোরেশন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভার জনপ্রতিনিধিদের গৃহীত কার্যক্রমেও অনেকক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলো সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেছে। এ প্রসঙ্গে একজন সমাজসেবা কর্মকর্তা বলেন,

[২৮] BRAC COVID-19 Yearbook 2020
[২৯] করোনা যুদ্ধে এনজিও ফেডারেশন (এফএনবি), *প্রাগুক্ত।*
[৩০] *প্রাগুক্ত।*
[৩১] *প্রাগুক্ত।*
[৩২] Annual Report 2020, Save The Children Bangladesh, available at: Link [accessed on 15 October 2021]
[৩৩] Caritas Bangladesh Response to COVID-19 Pandemic *প্রাগুক্ত।*
[৩৪] আরডিআরএস হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে।
[৩৫] গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) এর ত্রাণ তৎপরতা ও সচেতনতামূলক প্রচারনা, *প্রাগুক্ত।*

"একতা সংঘ ২০ জন ভলান্টিয়ার দিয়া আমাদের সাহায্য করেছে। ব্লিচিং পউডার দিয়ে সাহায্য করেছে। সচেতনতামূলক কাজ তারা করেছে। ত্রাণ সামগ্রী দিয়েছে। আমাদের সমাজসেবা থেকে তিন ধরনের ত্রাণ দিয়েছি। সেখানেও তারা ভলন্টিয়ার হিসেবে কাজ করেছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে।"

২.১.২.৪.করোনা সংক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবা

করোনাকালীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, করোনা মোকাবেলায় হাসপাতালগুলোকে প্রস্তুত করা এবং ডাক্তারদের যথাযথ সুরক্ষা উপকরণ দিয়ে সেবা প্রদানের জন্য প্রস্তুত করা অন্যতম চ্যালেঞ্জ ছিল। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সতর্কতামূলক অবস্থা গ্রহণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে কিছু কিছু হাসপাতালকে 'করোনা ডেডিকেটেড হসপিটাল' ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন হাসপাতালে করোনা আইসোলেশন ইউনিট তৈরি করা হয়। সরকারের পাশাপাশি জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হাসপাতাল তৈরিসহ হাসপাতাল ও ডাক্তারদের জন্য সুরক্ষা সামগ্রী ও করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করে। এগুলোর মধ্যে করোনা পরীক্ষার জন্য স্যাম্পল সংগ্রহে সহায়তা, স্যাম্পল সংগ্রহের বুথ স্থাপন, হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ, অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান, হাসপাতাল ও করোনা ডেডিকেটেড আইসিইউ স্থাপন, রোগী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উদাহারণস্বরূপ ফ্রেন্ডশিপ নামের এনজিও কমিউনিটি, স্যাটেলাইট ও স্ট্যাটিক ক্লিনিকসহ ভাসমান হাসপাতালের মাধ্যমে প্রায় ৬৯,০০০ পরিবারকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছে। স্থানীয় পর্যায়ে নোয়াখালির ইয়াং হেল্প হিউম্যান বিডি জরুরি প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে সরবরাহের জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রস্তুত করে রাখে।[৩৬] এছাড়া কিছু সংস্থা থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাও প্রদান করা হয়। এর বাইরে কিছু কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান থেকেও আইসোলেশন ইউনিট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। নিম্নে আরও কিছু সংস্থার উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির বিবরণ দেওয়া হল:

সারণি ৬: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির বিবরণ

প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি
ব্র্যাক[৩৭]	৬টি জেলায় ১১৬টি নমুনা সংগ্রহের বুথ স্থাপন, ৯টি টিকাদান কেন্দ্র পরিচালনা এবং গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত ৩,০০০ টিকাদান কেন্দ্রকে সহায়তা প্রদান
	মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় "মনের যত্ন মেবাইল-এ" নামক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এবং "মনের কথা" নামক অনলাইন ফোরাম চালু
	আইইডিসিআর এর হটলাইনে ২০ জন ডাক্তার নিযুক্তকরণ
সাজেদা ফাউন্ডেশন	৫৭০৫ জন আইসিইউ রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান[৩৮]
এসকেএস ফাউন্ডেশন	গাইবান্ধায় ১০০ শয্যাবিশিষ্ট আইসোলেশন কেন্দ্র স্থাপনে সহায়তা[১৫]
গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র[৩৯]	বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে টেকনিক্যাল সহায়তার পাশাপাশি গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে করোনা আক্রান্তদের জন্য নিবেদিত ১৫ শয্যাবিশিষ্ট আইসিইউ সেবা চালু
	করোনা শনাক্তে র‍্যাপিড টেস্ট কিট উদ্ভাবন যা এখনো সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায়
ঢাকা আহসানিয়া মিশন	৪০টি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে জরুরি ওষুধ ও অ্যাম্বুলেন্স সহায়তা প্রদান[৪০]

২.১.২.৫.নগদ অর্থ সহায়তা

করোনাকালে অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যার পাশাপাশি নগদ অর্থের সংকট প্রকট হয়ে উঠে। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এই সময়ে ব্যাপক আর্থিক সংকটে পড়ে। এই সংকট মোকাবেলায় সরকার নানা ধরনের প্যাকেজ ঘোষণা করে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে অভাবগ্রস্তদের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি

[৩৬] মুখ্যতথ্যদাতার সাক্ষাৎকার হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে।
[৩৭] BRAC COVID-19 Yearbook 2020
[৩৮] COVID-19 Response Activities of SAJIDA Foundation – As of December 15th, 2021, available at: https://sajidafoundation.org/covid-portal/coronavirus-covid-19/
[৩৯] Gonoshasthaya Kendra in Response to COVID-19, Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh, available at: https://bdplatform4sdgs.net/gonoshasthaya-kendra-in-rsponse-to-covid-19/ [accessed on 20 October 2021]
[৪০] DAM Response to COVID-19, Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh, available at: https://bdplatform4sdgs.net/dam-response-to-covid-19/ [accessed on 20 October 2021]

সংস্থাও ক্ষতিগ্রস্তদের নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করে। এক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাসমূহ হতে ত্রাণের প্যাকেজের সাথে একত্রে এবং পৃথকভাবেও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। নিম্নে আরও কিছু সংস্থার উল্লেখযোগ্য নগদ অর্থ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ দেওয়া হল:

সারণি ৭: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য নগদ অর্থ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ

প্রতিষ্ঠান	নগদ অর্থ বিতরণ কর্মসূচি
সাজেদা ফাউন্ডেশন	১৬,২৩,৮৩৫ টাকা নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান ও কর্মীদের ১ দিনের বেতন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান[৪১]
ব্র্যাক	সর্বমোট ৩,৯৪,৪৭১ পরিবারের মধ্যে প্রায় ৬০ কোটি টাকা বিতরণ[৪২]
	"ডাকছে আবার দেশ" ক্যাম্পেইন এর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ ও বিতরণ অব্যাহত[৪৩]
টিএমএসএস	প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল কর্মীদের একদিনের বেতন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান
আরডিআরএস বাংলাদেশ	২৪,৮৬২ পরিবারের মধ্যে ৩,৮৬,৪৩,০০০ টাকার অনুদান প্রদান[৪৪]
রাজবাড়ী উন্নয়ন সংস্থা (রাস)	৩০০ যৌনকর্মীকে ৭০০ টাকা করে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান[৪৫]
আশ্রয়	৪০০ কর্মহীন ও দরিদ্র অসহায় আদিবাসীকে ৭৫০ টাকা করে মোট ৩ লক্ষ টাকা নগদ অর্থ বিতরণ[৪৬]
সেভ দ্য চিলড্রেন	১৩৫,৯৬৫ পরিবারকে নগদ অর্থ প্রদান[৪৭]
এসকেএস ফাউন্ডেশন	৪,৮০৩ পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থ প্রদান[৪৮]
সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস	টাঙ্গাইলে যৌনকর্মীদের জনপ্রতি ৩০০ টাকা হিসাবে ৫১০ জনকে আর্থিক সহায়তা প্রদান[৪৯]

একজন মুখ্য তথ্যদাতার তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় পর্যায়ে ইয়াং বয়েজ নামক একটি সংস্থা শাহাপুর নোয়াখালীতে দুস্থদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করে।[৫] এছাড়াও বিভিন্ন সংস্থা সরকারের বিভিন্ন ফান্ডে অর্থ সহায়তা করেছে। এই প্রসঙ্গে একজন সমাজসেবা কর্মকর্তা বলেন,

> *"কিছু কিছু সংস্থা ত্রাণ বিতরণ করেছে। জেলা অফিসের ফান্ডে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আর্থিক সহযোগিতা করেছে। ঐ টাকা দিয়ে পরে ত্রাণ দেয়া হয়েছে।"*

স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় দুস্থ ও অভাবীদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়। নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে নগদ অর্থ পাঠানো হয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বেসরকারি সংস্থাসমূহের সুবিধাভোগীদের মধ্যে যারা বিভিন্ন ধরনের সহায়তা পেয়েছেন তাদের মধ্যে ২৪.৬ শতাংশ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা থেকে নগদ অর্থ সহায়তা পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

২.১.২.৬. লাশ দাফন বা সৎকার

করোনকালীন সময়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে এবং করোনার লক্ষণ নিয়ে মৃতদের দাফন ও সৎকার অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্পর্শ না করা, মৃতদেহ ফেলে রাখা ইত্যাদি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও গণমাধ্যমে নানা ধরনের তথ্য উঠে আসে। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এগিয়ে আসে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা করোনায় আক্রান্ত রোগীদের বহনের জন্য অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান এবং মৃতদের দাফন ও সৎকারের ব্যবস্থা করে। এ

---

[৪১] করোনা যুদ্ধে এনজিও ফেডারেশন (এফএনবি), *প্রাগুক্ত।*
[৪২] BRAC COVID-19 Yearbook 2020
[৪৩] COVID-19 Situation Update (Sep 2), [Previously mentioned]
[৪৪] আরডিআরএস হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে।
[৪৫] করোনা যুদ্ধে এনজিও ফেডারেশন (এফএনবি), *প্রাগুক্ত।*
[৪৬] *প্রাগুক্ত।*
[৪৭] Annual Report 2020, Save The Children Bangladesh ,[]
[৪৮] এসকেএস এর ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, *প্রাগুক্ত।*
[৪৯] করোনা যুদ্ধে এনজিও ফেডারেশন (এফএনবি), *প্রাগুক্ত।*

সংস্থাগুলোর মধ্যে আল মানহিল, আল মারকাজুল ইসলাম, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, রহমতে আলম সমাজসেবা সংস্থা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ও আল মারকাজুল ইসলাম সংস্থার প্রতিনিধিদের দেওয়া তথ্য মতে, ২০২০ সালের ১ এপ্রিল থেকে তারা এই ক্ষেত্রে কাজ করছে। মৃতদের পরিবারের সদস্যরা ভয় পেলেও লাশ দাফন বা সৎকারে সংস্থার সদস্যরা ভয় পেয়ে পিছপা হন নি। লাশ দাফন ও সৎকারের কাজে নিয়োজিত একজন স্বেচ্ছাসেবী বলেন,

> *"লাশের গোসল থেকে শুরু করে দাফনসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আমরা যখন ঘরে ফিরি, তখন নিজেরাই বুঝতে পারি না জীবিত আছি কি না। সুরক্ষা পোশাক- পিপিই, হাতে গ্লাভস, চোখে চশমাসহ পুরো পোশাক পরে গরমের মধ্যে কাজ করা যে কতটা কষ্টসাধ্য তা বলে বোঝানো যাবে না। দমবন্ধ হয়ে আসে একেক সময়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে লাশ নিয়ে রাজধানীর তালতলা কবরস্থানে কবর দেওয়া পর্যন্ত বেশিরভাগ সময় মৃত ব্যক্তিদের স্বজনেরাও কাছে আসেন না ভয়ে। তবে আমরা ভয় পাই না। এই মৃত ব্যক্তিরাতো আমাদেরই কারও না কারও স্বজন।[৫০]"*

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও সরকারের ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি ও নির্দেশনা মেনে নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে তারা লাশ দাফন ও সৎকারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।[৫১]আল মারকাজুল ২৮ মার্চ ২০২০ হতে করোনায় মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন বা সৎকার শুরু করে। ৮ জুলাই ২০২১ পর্যন্ত তারা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মোট ৪,৯৯৫ জন করোনায় মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন বা সৎকার করেছে। এর মধ্যে ৮০ জন হিন্দু, ৫ জন খ্রিস্টান ও ২ জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল[৫২]। এ কাজে তারা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রশিক্ষণসহ অব্যহত সহযোগিতা পেয়ে আসছে।

এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ের কিছু প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবীরাও করোনায় আক্রান্ত মৃতদের দাফনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর বাইরে কিছু কিছু এলাকায় জনপ্রতিনিধিরাও তাদের সমর্থকদের নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা লাশ দাফনের কাজ করে।

২.১.২.৭.করোনা বিষয়ক গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম

করোনা অতিমারি শুধু স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উপরই প্রভাব ফেলে নি, বরং সমাজ, অর্থনীতি, বৈদেশিক নীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কসহ পারিপার্শ্বিক সকল বিষয়ের উপর এর প্রভাব পড়েছে। করোনা অতিমারি এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রভাব নিয়ে বিশ্বজুড়ে নানা আলাপ আলোচনা ও গবেষণা চলছে। এসব গবেষণায় করোনাকালে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সরকারি-বেসারকারি সমন্বয়, সরকারের করণীয় ইত্যাদি নানা বিষয়ের চিত্র উপস্থাপিত হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের নীতি নির্ধারক ও গবেষকগণের পক্ষ থেকে মানসম্পন্ন গবেষণার গুরুত্ব ও এর পরিমাণ বাড়ানোর বিষয়ে সুপারিশ উঠে আসে।

বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা ও দ্রুততার সাথে সেগুলোর ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো বেশ তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়।[৫৩] বাংলাদেশে করোনা শনাক্তের পর প্রথম সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয় ২৬ মার্চ ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০০০ পর্যন্ত। এই সময় বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ থাকায় এর অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করে পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)। তাদের গবেষণার ফলাফল 'করোনার কারণে নতুন করে ২০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে'- পরবর্তীতে নীতি নির্ধারকদের মধ্যে সাড়া ফেলে দেয়।

নাগরিক সংগঠন বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রীর (পিপিই) বিষয়ে সম্মুখসারির স্বাস্থ্যকর্মীদের মতামত নিয়ে জরিপের ফলাফল প্রকাশ করে ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে। জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ এর ২২০ জন কর্মকর্তা তাদের বর্ধিত বেতন আর বোনাসের টাকা গ্রহণ না করে গবেষণার কাজে লাগিয়েছেন। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের তথ্য অনুযায়ী তারা ইতোমধ্যে ১৬টি গবেষণার কাজ সম্পন্ন করেছিল এবং বর্তমানে আরও ৩২টি গবেষণার কাজ চলমান। ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রীর মান নিয়ে করোনা সংকটের শুরুর দিকে বেশ আলোচনার জন্ম হয়। সে সময় বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রীর (পিপিই) বিষয়ে সম্মুখসারির স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর জরিপ পরিচালনা ও ফলাফল প্রকাশসহ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত আটটি জরিপ সম্পন্ন করে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গড়া গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'আন্ডারগ্রাজুয়েট রিসার্চ অরগানাইজেশন' করোনা সংক্রমণের কয়েক মাসের মধ্যেই প্রায় ১৫টি গবেষণা প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে যার মধ্যে একটি বিখ্যাত 'ল্যানসেট' সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়।[৯]

এছাড়া যেসব প্রতিষ্ঠান এ ধরনের কাজ করেছে তাদের মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়ন প্ল্যাটফর্ম, আইসিডিডিআরবি, সিপিডি, ব্রাক, টিআইবি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

---

[৫০] প্রথম আলো, 'করোনায় মৃতদের শেষ সম্মানটুকু দেখান তাঁরা',১২ মে,২০২০, বিস্তারিত দেখুন: লিংক [পরিদর্শনের সময় ঃ ৩ সেপ্টেম্বর ২০২১]

[৫১] *প্রাগুক্ত*।

[৫২] আল মারকাজুল হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে।

[৫৩] *প্রথম আলো*, 'দেশে করোনা মোকাবিলায় গবেষণা কম ',২০ সেপ্টেম্বর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: লিংক [পরিদর্শনের সময় ঃ ৪ সেপ্টেম্বর ২০২১]

২.১.২.৮. অভিবাসীদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম

করোনাকালীন সংকটের শুরুর দিকে অনেক অভিবাসীর পক্ষে দেশে রেমিটেন্স পাঠানো সম্ভব হয়নি। যারা বিদেশে যাওয়ার জন্য টাকা-পয়সার জমা দিয়েছিল, ঐ সময়ে তারা যেতে পারেনি। যারা স্বল্পমেয়াদি ছুটিতে দেশে এসেছিলেন তারাও ফিরে যেতে পারছিলেন না। অনেকক্ষেত্রে গন্তব্য রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক নিয়মের তোয়াক্কা না করে অভিবাসী কর্মীদের দেশে ফেরত পাঠাচ্ছিল এবং বাংলাদেশ সরকারকে চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছিল তাদেরকে গ্রহণ করার জন্য। এমতাবস্থায় কিছু সংস্থা তাদের জন্য সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) সর্বপ্রথম এপ্রিল ২০২০-এ অভিবাসন ও অভিবাসীদের বিভিন্ন সংকট এবং তা থেকে উত্তরণের সুপারিশ প্রদান করে সিচুয়েশন প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসীদের অর্থ সহায়তা প্রদান করা, পুনর্বাসন করা, অভিবাসী প্রত্যাশীদের জমাকৃত অর্থ ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা করা অথবা বাজার স্বাভাবিক হলে তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশে পাঠানো. পাশাপাশি গন্তব্য রাষ্ট্রগুলোর এভাবে একতরফাভাবে অভিবাসীদের দেশে পাঠানোর ব্যাপারে নিন্দা জ্ঞাপন করা ও তাদের বকেয়া পাওনা পরিশোধ- এইসব ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। এছাড়াও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশের বিভিন্ন মিটিং ও সেমিনারে উপস্থিত হয়ে অভিবাসীদের অধিকার রক্ষায় সুপারিশ প্রদান করে যার অনেকগুলো পরবর্তীতে তাদের কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঢাকার দক্ষিণখানে অবস্থিত রামরু'র মাইগ্রেন্ট সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে অসংখ্য অভিবাসী যারা জরুরি ভিত্তিতে দেশে ফিরেছিল তাদের থাকা এবং খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এছাড়াও কিছু দুস্থ আদিবাসী নারীদের চিকিৎসাসেবা দেওয়ার পাশাপাশি দুস্থ অভিবাসী বিশেষকরে যাদেরকে করোনার সময় দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে সেইসব পরিবারদের অর্থ ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

অতিমারির সময়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকে ২১৯ জন, ভিয়েতনাম থেকে মানবপাচারের শিকার ৮৩ জন, এবং লেবানন থেকে ২৮ জন অভিবাসীকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। দেশে ফেরার পর কোনোরকম সংগত কারণ ছাড়াই দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা এবং কোয়ারেন্টাইনে নিয়মভঙ্গের অজুহাতে তাদের জেলে পাঠানো হয়। রামরু কোনো অর্থ সহায়তা ছাড়াই স্বপ্রণোদিত হয়ে দুইজন আইনজীবীর সহায়তায় এসব মামলার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করে এবং পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মামলাগুলি তুলে নেয়। এর ফলে কয়েকশো পরিবার বড় ধরনের ভোগান্তি থেকে বেঁচে যায়।[৫৪]

এছাড়া অভিবাসীদের জন্য ব্র্যাকের গৃহীত কার্যক্রমগুলোর মধ্যে ফেরত আসা ১,২৩৩ জন প্রবাসী এবং ৬৮টি প্রবাসী পরিবারকে কাউন্সিলিং সেবা প্রদান, ৭,০০০ ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসীর পরিবারকে নগদ অর্থ সহায়তা, ৫,০০০ অভিবাসীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান ও বিদেশ হতে প্রত্যাগতদের কোয়ারেন্টাইনের জন্য সরকারকে ৪৩০টি আবাসন কক্ষ প্রদান উল্লেখযোগ্য।

২.১.২.৯.প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণ

করোনাভাইরাসের কারণে দেশের ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন খাতের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে প্রণোদনা প্যাকেজের অংশ হিসেবে ব্যাংকের মাধ্যমে প্রায় এক লাখ কোটি টাকা ঋণের ব্যবস্থা করে সরকার। শিল্প ও সেবা খাতে ঋণের বড় অংশ বড় শিল্পগ্রুপ, প্রভাবশালী এবং ঋণখেলাপিদের কাছে চলে যাওয়া ও কুটির, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাতের জন্য বরাদ্দ করা ঋণও প্রান্তিক পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের কাছে না পৌঁছানোর অভিযোগ ওঠে।[৫৫]

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অন্যান্য খাত/প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা তুলনামূলকভাবে অধিক কার্যকরভাবে প্রান্তিক ও নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঋণ বিতরণ করে। প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত তিন হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে বিতরণের জন্য প্রায় ২,৭৭৩.৮৪ কোটি টাকার বরাদ্দ অনুমোদন করা হয় এবং ১৮৪টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২,১৩৭.৮১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। এ সংস্থাগুলোর মাধ্যমে প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ৩ লাখ ৬০ হাজার ৬৩৬ জন গড়ে ৪২ হাজার ৯২৫ টাকা প্রণোদনা ঋণ পায় যার মধ্যে নারীর সংখ্যা ৩ লাখ ২৪ হাজার ৫৬০ জন।[৫৬]

২.১.৩. সরকারের অংশীজন হিসেবে ভূমিকা পালন

বেসরকারি সংস্থাগুলো নিজেদের কাজের পাশাপাশি সরকার ও সরকারের স্থানীয় প্রশসনের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের ক্ষেত্রেও অংশীজন হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। এসব কাজের মধ্যে সচেতনতামূলক কাজ, ভুক্তভোগীদের তালিকা তৈরি, ত্রাণ বিতরণ,

---

[৫৪] মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে।

[৫৫] *প্রথম আলো*, 'বড়রা পেয়েছে বেশি, ছোটরা অনেক কম',৩১ মে ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: wjsK [পরিদর্শনের সময় ঃ ৬ সেপ্টেম্বর ২০২১]

[৫৬] এমআরএ হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে।

সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ, টিকাদান কর্মসূচি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬৮ শতাংশ প্রতিষ্ঠান করোনা পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কাজে সরকারের অংশীজন হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে (চিত্র ৪)।

চিত্র ৪: সরকারের অংশীজন হিসেবে ভূমিকা পালনের হার

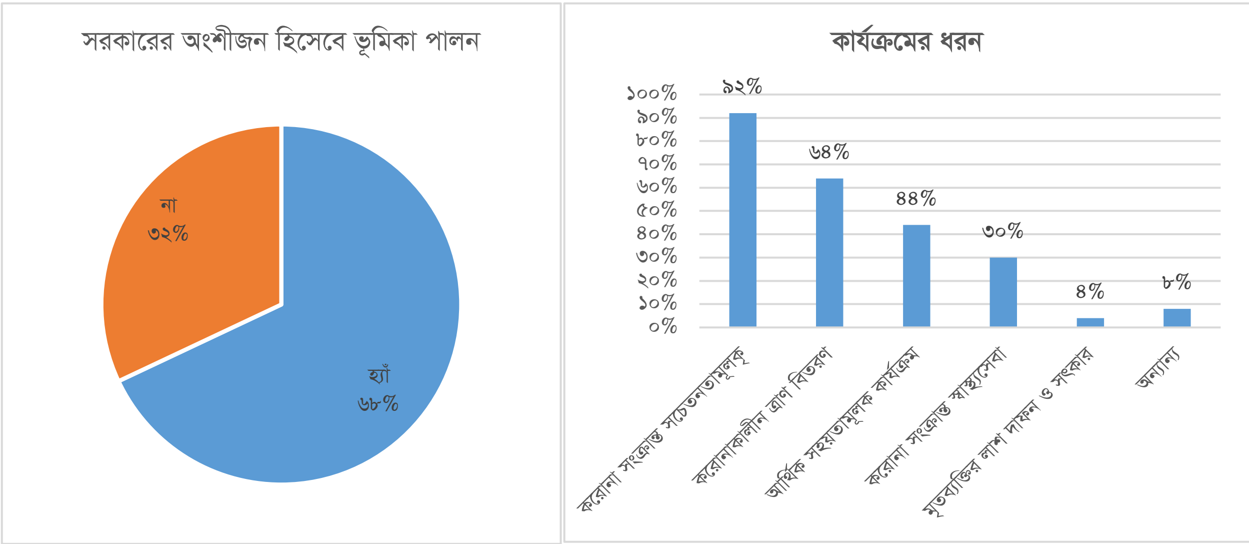

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যারা সরকারের অংশীজন হিসেবে কাজ করেছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশ (৯২%) প্রতিষ্ঠানই সরকারের করোনা বিষয়ক সচেতসতামূলক কার্যক্রমে সাথে সম্পৃক্ত ছিল। করোনাকালীন সরকারের সহযোগী হিসেবে ৬৪% প্রতিষ্ঠান ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে এবং ৪৪% প্রতিষ্ঠান আর্থিক সহায়তামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া প্রায় এক তৃতীয়াংশ সংস্থা (৩০%) করোনা সংক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবা এবং অল্প কিছু সংখ্যক সংস্থা (৪%) করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তিদের লাশ দাফন বা সৎকার সংক্রান্ত কার্যক্রমে সরকারের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করে(চিত্র ৪)। একজন সমাজসেবা কর্মকর্তা বলেন,

> *"একতা সংঘ ২০ জন ভলান্টিয়ার দিয়া আমাদের সাহায্য করেছে। ব্লিচিং পউডার দিয়ে সাহায্য করেছে। একটা প্রতিষ্ঠান আছে যারা টিকা দিচ্ছে সেখানেও এরা সহযোগিতা করছে।"*

৩. তৃতীয় অধ্যায়

৩.১. কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বেসরকারি সংস্থার সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

করোনার সময়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু এসব কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদেরকে নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। করোনা সংকটে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য যে ধরনের সক্ষমতা ও সম্পদ প্রয়োজন ছিল তার ঘাটতি প্রায় সকল ধরনের সংস্থার মধ্যেই লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে এই পরিস্থিতিতে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেরই স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ ছিলো, যা করোনাকালীন বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপকে আরও বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬৬.২ শতাংশ প্রতিষ্ঠান করোনা পারিস্থিতিতে কোনো না কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে (চিত্র ৫)।

চিত্র ৫: করোনা পরিস্থিতিতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া

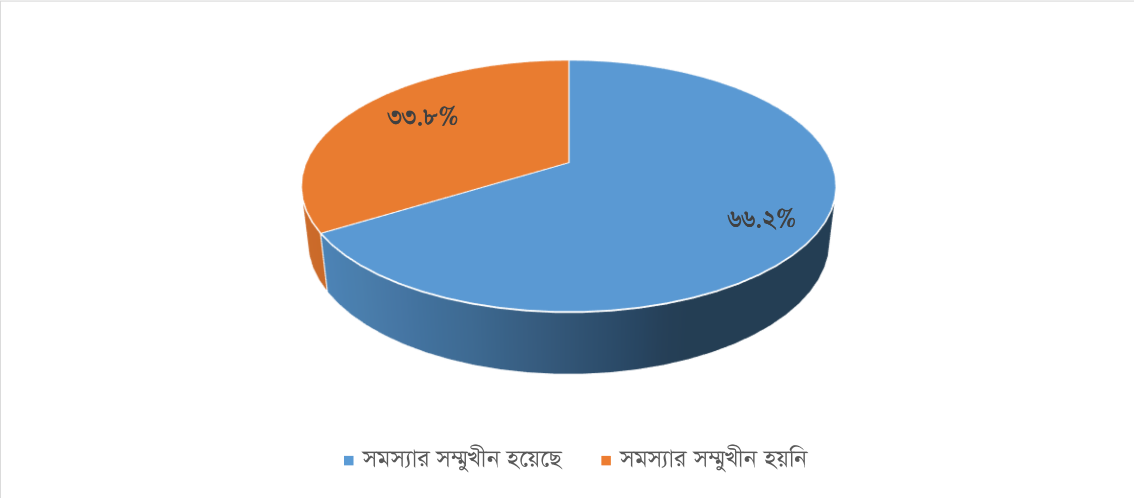

৩.২. কর্মসূচি বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ করোনাকালীন সময়ে তাদের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে তহবিল সংকট, উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে জটিলতা, রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা, স্থানীয় ক্ষমতাশালীদের প্রভাব, প্রশাসন হতে বিভিন্ন বিষয়ে অনুমোদন গ্রহণের ক্ষেত্রে জটিলতা, দুর্গম এলাকায় ত্রাণ পৌঁছানো, জনপ্রতিনিধিদের অসহযোগিতামূলক আচরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও পর্যাপ্ত সুরক্ষা সামগ্রীর অভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক বেসরকারি সংস্থা মাঠ পর্যায়ে তাদের কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে নি।

চিত্র ৬: করোনা পরিস্থিতিতে এনজিওসমূহের সম্মুখীন হওয়া চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্র

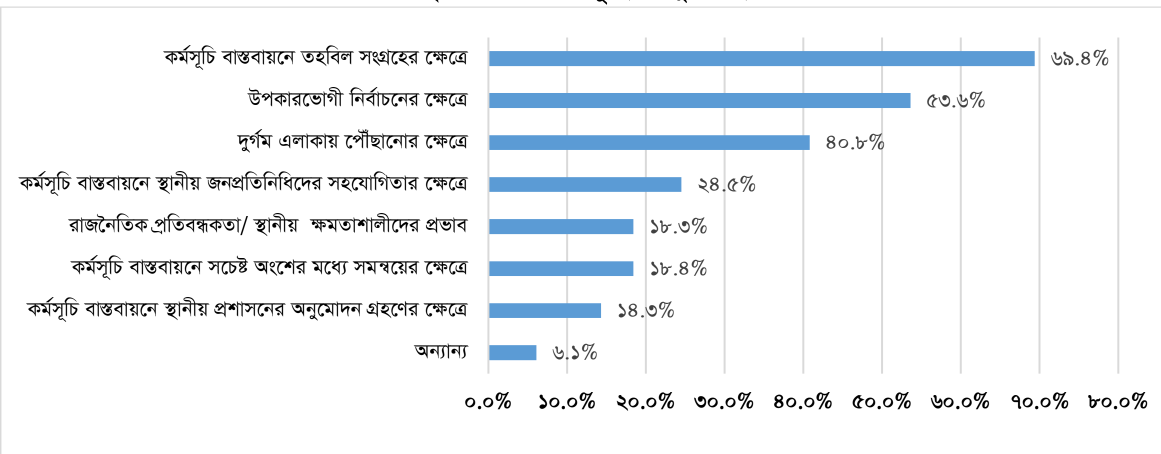

৩.২.১. তহবিল সংকট

করোনা পরিস্থিতিতে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বেসরকারি সংস্থাগুলো যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা ছিল প্রধান চ্যালেঞ্জ। বড় পরিসরে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং কর্মসূচি চলমান রাখার ক্ষেত্রেও সংস্থাগুলোর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল তহবিল সংকট। অনেক বেসরকারি সংস্থারই নিজস্ব কোনো নিয়মিত অর্থের উৎস নেই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের প্রদত্ত অর্থই এসব সংস্থার অর্থ বা তহবিল এর প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। একটি

গবেষণায় দেখা গেছে, ৫৪ শতাংশ এনজিও যাদের নিজস্ব উপার্জনের বা অর্থের উৎস আছে, তার ৫০ শতাংশই আসে তাদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম থেকে।[৫৭]

চিত্র ৭: কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তহবিলের উৎস

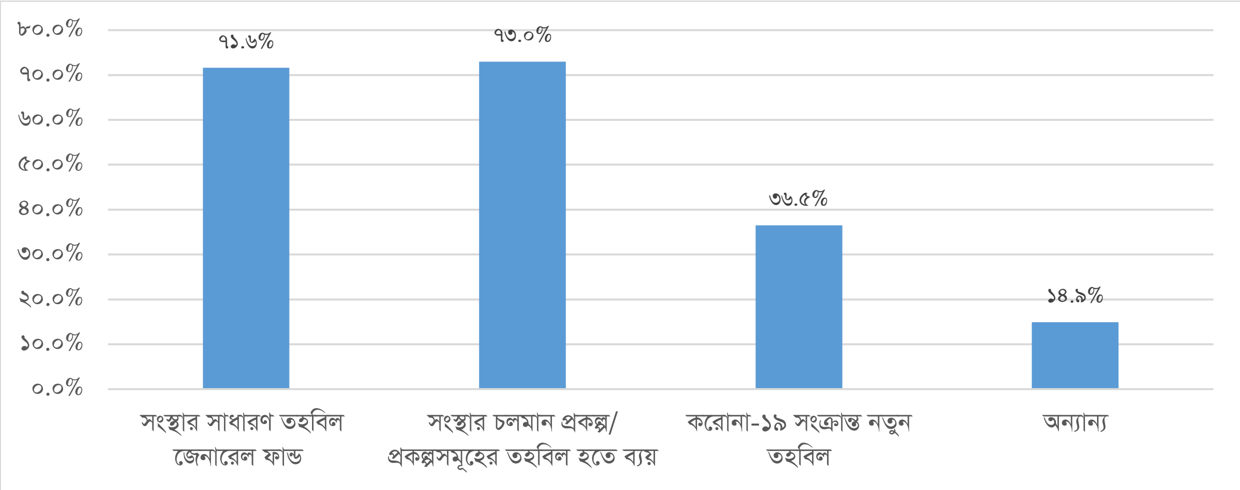

করোনা সংকট মোকাবেলায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে দুই তৃতীয়াংশের বেশি সংস্থার তহবিলের মূল উৎস ছিল সাধারণ তহবিল (জেনারেল ফান্ড) ও চলমান প্রকল্প/ প্রকল্পসমূহের তহবিল (চিত্র ৭)। এছাড়া গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৩৬.৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠান (২৭টি) কোভিড সংক্রান্ত নতুন তহবিল গঠন করেছে কিংবা সংগ্রহ করেছে।

কিন্তু, করোনা পরিস্থিতিতে এসব সংস্থা তাদের নিয়মিত কার্যক্রম ও করোনা মোকাবেলা বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে তাদের বাৎসরিক একটা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল ছিলো। একজন সমাজসেবা কর্মকর্তা বলেন,

> *"প্রতিষ্ঠানগুলো তেমন সমস্যা ফেস করেছে কিনা সেটা জানি না। তবে তাদের আর্থিক সংকট ছিলো। কোনো প্রতিষ্ঠানই সরকারি অনুদান পায় নি। সেক্ষেত্রে আমি ব্যক্তিগত তহবিল থেকে সাবান দিয়েছি প্রতিবন্ধীদের। চ্যালেঞ্জ মূলত অর্থের সমস্যা।"*

ক্ষুদ্রঋণ কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এই সময়ে আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়তে হয়েছে। স্বাভাবিক সময়ে (২০১৮-১৯ অর্থবছরে) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৩১৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে, সেখানে করোনা পরিস্থিতির কারণে এই সময়ে প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকা কম ঋণ বিতরণ হয়। এছাড়া ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ৩০ শতাংশ আয় হ্রাস পেয়েছে। এমআরএ'র তথ্য অনুযায়ী এর বাইরে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার সামাজিক কার্যক্রম বন্ধ ছিলো। স্বাভাবিক সময়ে যে পরিমাণ সঞ্চয় আদায় হতো করোনা পরিস্থিতির কারণে তার চেয়ে ১০ হাজার কোটি টাকা সঞ্চয় কম আদায় হয়েছে।[৫৮] এমআরএ'র জারিকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করে ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ক এসব প্রতিষ্ঠান লকডাউন চলাকালে তাদের প্রদত্ত ঋণের কিস্তি সংগ্রহ করা স্থগিত রাখে। এছাড়া ঋণের শ্রেণীকরণ বন্ধ রাখা, ঋণগ্রহীতাদের সুবিধাজনক সময়ে ঋণ বা কিস্তি পরিশোধের সুযোগ করে দেওয়া, কিস্তির টাকার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়াসহ ঋণগ্রহীতাদের আরও বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করে। এর ফলে ছোট এনজিও-এমএফআইসমূহের একদিকে যেমন তাদের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে সমস্যা হয়েছে, অন্যদিকে করোনা বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হয়েছে।[১৩] গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬৯ শতাংশ প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে যে কর্মসূচি বাস্তবায়নে তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে তারা নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে (চিত্র ৬)। একটি সংলাপে স্থানীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিরা বলেছেন, করোনা পরিস্থিতিতে তাঁরা সম্পদের ঘাটতিতে পড়েছেন। আর্থিক সংকটসহ নানা ঝুঁকির মধ্যেও আছে সংস্থাগুলো। তাদের কাজেও সমন্বয়ের ঘাটতি আছে। আবার সরকারের পক্ষ থেকেও কোনো স্বীকৃতি নেই।[৫৯]

---

[৫৭] *প্রথম আলো*, 'মাঠপর্যায়ের ৯০% এনজিও আর্থিক সংকটে', ৯ জুলাই ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: লিংক **[পরিদর্শনের সময় ঃ ১৬ জুন ২০২১]**

[৫৮] এমআরএ-এর মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে।

[৫৯] *প্রথম আলো*, 'মাঠপর্যায়ের ৯০% এনজিও আর্থিক সংকটে', *প্রাগুক্ত*।

চিত্র ৮: তহবিল কর্তনের প্রভাব

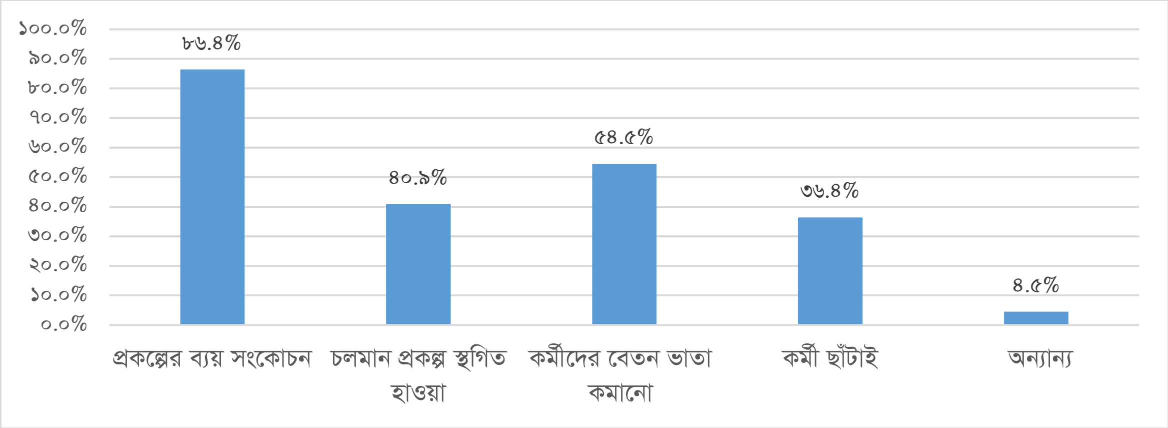

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬২টি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দাতা সংস্থার অর্থায়নে তাদের নিয়মিত কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করে থাকে। এর মধ্যে ৩৫% প্রতিষ্ঠানের চলমান প্রকল্পগুলো থেকে করোনার সময়ে দাতা সংস্থা গড়ে প্রায় ২৫% তহবিল হ্রাস করে। এর ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশেরই (৮৭%) প্রকল্পের ব্যয় সংকোচন করতে হয় (চিত্র ৮)। তখন চলমান প্রকল্প স্থগিত করে, কর্মীদের বেতন ভাতা কমিয়ে অথবা কর্মী ছাঁটাই করে তাদেরকে সংকুচিত তহবিলের সাথে সমন্বয় সাধন করতে হয়।

৩.২.২. উপকারভোগীদের তালিকা প্রণয়নে জটিলতা এবং ক্ষমতাশীলদের প্রভাব:

করোনা সংকট মোকাবেলা বিষয়ক কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যে ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় তার মধ্যে উপকারভোগী নির্বাচন ও তাদের কাছে সাহায্য পৌঁছানো অন্যতম। সাধারণত স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে উপকারভোগীদের তালিকা প্রণয়ন ও নির্বাচন করা হয়। তবে এক্ষেত্রে কোনো কোনো পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। কিছু কিছু জায়গায় সাহায্য প্রাপ্তির জন্য উপযোগী না হওয়া সত্ত্বেও প্রভাবশালীরা তাদের পরিচিত লোকজন ও আত্মীয়-স্বজনের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে এবং ক্ষেত্রে বিশেষে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী তালিকা প্রণয়ণ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। এই প্রসঙ্গে একজন সমাজসেবা কর্মকর্তা বলেন,

> *“একটা চ্যালেঞ্জ হলো উপকারভোগী তালিকা বানানোর ক্ষেত্রে পলিটিক্যাল প্রেসার থাকে। সেখানে তারা যেভাবে সুপারিশ করে সেভাবে দিতে হয়।”*

উপকারভোগীদের তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেখা গেছে কোনো কোনো জায়গায় একজন ব্যক্তির নাম একাধিকবার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যেখানে সাহায্যের উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও কারো কারো নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় নি বা কোনো সাহায্য পায় নি। ক্ষেত্রবিশেষে দলিত জনগোষ্ঠীর তালিকা প্রণয়নে দলিত কমিউনিটির নেতা কর্তৃক পরিচিতজনদের তালিকাভুক্ত করতে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে সাহায্যপ্রার্থীদের হার বেশি থাকার কারণে তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও সংস্থাগুলোকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। অন্য একজন সমাজসেবা কর্মকর্তা এই প্রসঙ্গে বলেন,

> *“অনেক সময় বেশী চাহিদা থাকার জন্য সিলেকশন করতে গিয়ে কিছুটা সমস্যা হয়েছে। ... একে না দিয়ে ওকে কেনো দেয়া হলো সেটা নিয়ে কিছু সমস্যা হয়েছে। অনেকে দুইবারের জন্য চাইছে।”*

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী অর্ধেকেরও বেশি (৫৩.৬%) সংস্থা উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। এছাড়া ১৮.৩% সংস্থা বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা এবং স্থানীয় ক্ষমতাশালীদের প্রভাবের শিকার হয়েছে (চিত্র ৬)। এছাড়াও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ২টি প্রতিষ্ঠান জেলা প্রশাসন কর্তৃক উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ করে। একজন এনজিও প্রতিনিধি এই প্রসঙ্গে বলেন,

> *“সীমিত অর্থ দিয়ে অনেক মানুষকে সহায়তা করার সুযোগ ছিল না। অনেকে বঞ্চিত ছিল, কিন্তু অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রদানের পরও সুবিধাভোগীদের অনেকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তাছাড়া স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করে ত্রাণ ও খাদ্য সামগ্রী প্রদান করতে হয়। এক্ষেত্রে কর্মসূচি পরিকল্পনায় পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী তথা দলিত, হরিজন, তৃতীয় লিঙ্গ-এদের বাদ দিয়ে প্রশাসন হতে প্রদত্ত তালিকা অনুসরণ করতে বলা হয়। এটিও একটি বড় ধরনের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ।”*

৩.২.৩. অন্যান্য চ্যালেঞ্জ

কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো আরও যেসব ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়েছে তার মধ্যে দুর্গম ও দূরবর্তী এলাকায় ত্রাণ পৌঁছানো অন্যতম। চিত্র ৬ থেকে দেখা যাচ্ছে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৪১ শতাংশ প্রতিষ্ঠান দুর্গম এলাকায় ত্রাণ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। এছাড়া প্রায় ২৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠান কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অসহযোগিতার কথা উল্লেখ করেছে।[৬০]

[৬০] এছাড়া অন্যান্য গবেষণাতেও প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়েছে তা উঠে এসেছে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কার্যক্রম পরিচালনায় ৭৭ শতাংশ সংস্থা নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। ঐ জরিপের ফলাফল অনুযায়ী করোনা পরিস্থিতিতে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করা স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থাগুলো আট ধরনের সমস্যায় পড়েছে। এগুলো হলো সম্পদের অপ্রতুলতা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কার্যক্রম পরিচালনায় অসুবিধা, মাঠকর্মীদের পর্যাপ্ত সুরক্ষাসামগ্রীর অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগে কার্যক্রম ব্যাহত, প্রকল্পের টাকা কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ব্যবহারে নমনীয়তার অভাব, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অসহযোগিতা, প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ ও প্রশাসনের অসহযোগিতা। *প্রথম আলো*, 'মাঠপর্যায়ের ৯০% এনজিও আর্থিক সংকটে', *প্রাগুক্ত*।

৪. চতুর্থ অধ্যায়

৪.১. তহবিল সংগ্রহ, ব্যয় ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে শুদ্ধাচার চর্চা

বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অতীতের যেকোনো মানবিক বিপর্যয়ের মত করোনা সংকট মোকাবেলায় বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এবং এনজিও একইভাবে এগিয়ে এসেছে এবং বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে যা ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল তহবিল সংগ্রহ। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি যে নতুন তহবিল সংগ্রহ করে অথবা চলমান প্রকল্পের একাংশ ব্যবহার করে তারা এসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। তবে তদারকি প্রতিষ্ঠানের প্রায় সকল মূখ্য তথ্যদাতার মতামত অনুযায়ী এসব তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয়ে তেমন কোনো অনিয়ম পাওয়া যায় নি। একজন সমাজসেবা কর্মকর্তা এ সম্পর্কে বলেন,

> *"আমরা তেমন অনিয়মের অভিযোগ পাই নি। তাছাড়া স্বেচ্ছাসেবী সংস্থারগুলোর কাজের ক্ষেত্রে অনিয়ম উঠার কথা না। তারা নিজেরা ফান্ড সংগ্রহ করে মানুষের জন্য দেয়। এখানে অনিয়ম করার তেমন সুযোগ নাই।"*

এছাড়া অনিয়ম-অসংগতি সম্পর্কে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর একজন কর্মকর্তা বলেন,

> *"এই সময়ে আসলে সেই রকম কোনো অভিযোগ আসেনি। সবাই যার যারা জায়গা থেকে কাজ করার চেষ্টা করেছে। সমন্বয়ের ক্ষেত্রেও তেমন কোনো অভিযোগ আসেনি। অনিয়ম-অসংগতিও ছিলো না।"*

তবে গবেষণার অন্যান্য সূত্রানুসারে একটি এনজিওর ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এনজিওটির বিপক্ষে প্রকল্প বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অনুপস্থিত স্থানীয় পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বাক্ষর জালিয়াতির মাধ্যমে সম্মানী ও প্রশিক্ষণভাতা আত্মসাৎ, বরাদ্দকৃত আপ্যায়ন খরচের এক তৃতীয়াংশ খরচ করে বাকি অংশ ভুয়া বিল-ভাউচারের মাধ্যমে আত্মসাৎ-এর মত গুরুতর অভিযোগ পাওয়া যায়।

সাহায্যপ্রার্থীদের একটি সাধারণ অভিযোগ ছিল উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কোনো সাহায্য না পাওয়া। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা চাহিদার তুলনায় তহবিলের অপ্রতুলতা প্রধান কারণ হতে পারে বলে মনে করেন। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত অন্য একজন সমাজসেবা কর্মকর্তা এ সম্পর্কে বলেন,

> *"অনেকেই অভিযোগ দিয়েছে যে তারা পাওয়ার যোগ্য ছিলো, কিন্তু, অপ্রতুলতার জন্য পায় নি।"*

তবে কিছু উপকারভোগীর কাছ থেকে তালিকা প্রণয়নে স্বজনপ্রীতি, তালিকা ওভারলেপিং হওয়া, তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য তদবির করার মত কিছু অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বেসরকারি সংস্থাসমূহের উপকারভোগী যাদের করোনা সংকটকালে সাহায্যের প্রয়োজন ছিল তাদের ১৪ শতাংশ (৮১ জন) সাহায্য পাওয়ার জন্য কোনো না কোনো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার তালিকাভুক্ত হয়েছিল। এদের মধ্যে ৩২.২ শতাংশ তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমস্যা বা অনিয়মের অভিযোগ করেছে। তালিকাভুক্তদের ২০ শতাংশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তদবির করতে হয়েছে বলে জানিয়েছে। এছাড়া কেউ কেউ স্বজনপ্রীতি এবং তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরও ত্রাণ না পাওয়ার অভিযোগ করেছে। উল্লিখিত সমস্যা ও অনিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে মাত্র নয়জন উপকারভোগী সংশ্লিষ্ট সংস্থাতে অভিযোগ দায়ের করে এবং সবার ক্ষেত্রেই অভিযোগ গ্রহণ করা হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

অন্যদিকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত মাত্র চারটি (৫.৪%) প্রতিষ্ঠানে উপকারভোগীরা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বা কর্মসূচি নিয়ে অভিযোগ দায়ের করে। এক্ষেত্রে প্রায় সকলেই উপকারভোগী নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ করে।

৪.২. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি

কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ সংস্থারই করোনাকালীন গৃহীত কর্মসূচির ধরন, আওতা, ব্যয়, উপকারভোগীর তথ্য সংস্থার ওয়েবসাইটে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করা হয়নি। কিছু প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির ধরন দেওয়া থাকলেও তার আওতা ও ব্যয় উল্লেখ করা হয়নি।

৪.৩. ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অনিয়ম

বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশেষ করে কৃষি অর্থনীতি এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কার্যক্রমে উন্নয়নের পেছনে গার্মেন্ট ও বৈদেশিক রেমিটেন্সের পাশাপাশি যে খাতটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে, তা হচ্ছে এনজিও ও এমএফআইয়ের ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা। করোনার সংক্রমনের শুরুর দিকে ছয় মাসের জন্য এনজিও ঋণের কিস্তি শিথিল করেছিল নিয়ন্ত্রক সংস্থা এমআরএ। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সেটিকে খেলাপি বা বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না বলে অধ্যাদেশ জারি করে।

কিন্তু সরকারের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় পর্যায়ে অনেক ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ঋণের কিস্তি আদায়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগ উঠেছে। অনেক সুবিধাভোগী স্থানীয় প্রশাসন বিশেষকরে উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের কাছে ঋণের কিস্তির চাপের জন্য অভিযোগ করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ঋণগ্রহীতা দুইটি এনজিওর কাছ থেকে ২ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তী পাঁচ মাস যাবত তিনি প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত কিস্তির টাকা দিয়ে আসছিলেন। করোনা অতিমারির শুরুর দিকে তিনি আর্থিক সংকটে পড়েন কিন্তু এনজিও কর্তৃপক্ষ এই অর্থসংকট, অতিমারি কিছুই বিবেচনায় নিচ্ছে না বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন,

> *"হামরা কছি যে, তিন মাস লকডাউন দিচে, আপনে ট্যাকার চাপ দ্যান ক্যা? হামি বলতেছি যে, হামার স্বামী বাইরে আছে দিবার পারতেছে না। এরা শোনেই না। হামি তারপর বলছি যে, আপনে কি কিস্তির জন্যে গলাত দড়ি দিবার কচ্ছেন হামাক? কয় না না গলাত দড়ি দেবেন ক্যা, আপনি চেষ্টা করেন। তো চেষ্টা করলে কোটে পাওয়া যায় কন। এই মুহূর্তে কাম করলেই মানুষ ট্যাকা পাচ্ছে না।*[৬১]

চিত্র ৯: কিস্তি পরিশোধের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সেবাগ্রহিতাদের বিন্যাস ও সমস্যার ধরন

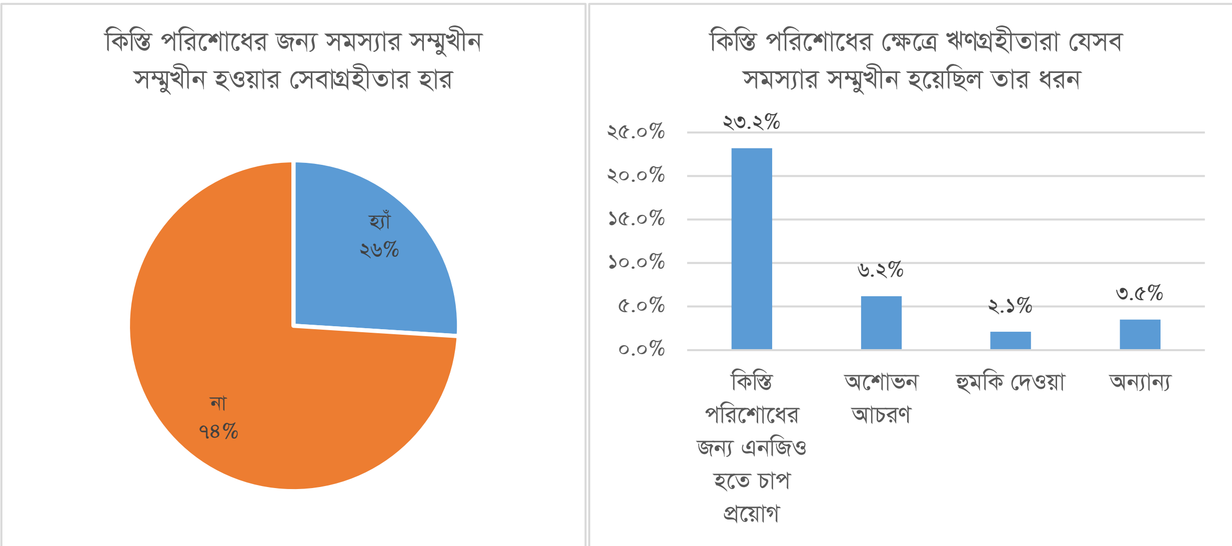

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৭১ শতাংশ (৪১৮ জন) কোনো না কোনো এনজিও হতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের নিয়মিত উপকারভোগী ছিলেন। চিত্র ৯ থেকে দেখা যাচ্ছে যে এদের মধ্যে প্রায় ২৬% (১০৭ জন) করোনার সময়ে ঋণের কিস্তি পরিশোধের জন্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রায় ২৩ শতাংশ ঋণগ্রহীতার অভিযোগ ছিল করোনাকালীন তাদেরকে ঋণের কিস্তি পরিশোধের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল, প্রায় ৬.২ শতাংশ কিস্তি আদায়ের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মীর দ্বারা অশোভন আচরণের শিকার হয়েছিলেন, এবং ২.১ শতাংশ এ ব্যাপারে হুমকিও পেয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ সুদের হার বৃদ্ধি করে দেওয়া, কিস্তি পরিশোধ করতে না পারায় জরিমানার শিকার হওয়ার মত গুরুতর অভিযোগও করেছেন।

[৬১] বিবিসি বাংলা, করোনা ভাইরাস: "কিস্তির জন্যে কি গলাত দড়ি দিবার কচ্ছেন হামাক", ৩ জুলাই ২০২০।

৫. পঞ্চম অধ্যায়

৫.১. তদারকি প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তদারকি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথিরিটি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, দাতা সংস্থা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৫.১.১. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ভূমিকা

বেসরকারি সমূহের কার্যক্রম তদারকি, প্রকল্প অনুমোদনসহ নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। করোনা পরিস্থিতিতে প্রথম দিকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কার্যক্রম সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। তবে পরবর্তীতে প্রকল্প অনুমোদন ও বাজেট অনুমোদনের ক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো অনলাইন কার্যক্রম চালু করে। ফলে প্রথমদিকে সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্ত হলেও অনলাইন কার্যক্রমের কারণে প্রকল্প অনুমোদন ও বাজেট অনুমোদন কার্যক্রম যথাযথভাবে পারিচালিত হয়েছে। গবেষণায় জরিপে অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলো ক্ষেত্রবিশেষে সময়ক্ষেপণের অভিযোগ করেছে। তবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে যথাযথভাবে এবং তড়িৎ অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর একজন কর্মকর্তা বলেন,

> *“আমাদের অনুমোদন সবসময় চালু ছিলো। এমনকি কোভিড শুরু হওয়ার প্রথম দিকে যেনো কোনো প্রজেক্ট বন্ধ না হয়ে, প্রতিষ্ঠানুগলোর কাজ যেনো চালু থাকে সে জন্য আমরা অনলাইনে অনুমোদনের ব্যবস্থা রেখেছি। অন্য সময়ের তুলনায় এই সময়ে আমরা চেষ্টা করেছি যেনো অনুমোদন আটকে না থাকে। কোনো ক্ষেত্রে যদি ত্রুটি থাকতো সেটা আমরা আবার সংশোধন করে তারপর ঠিক করে দিয়েছি।”*

করোনাকালীন উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় এনজিও বিষয়ক ব্যুরো জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ১৭৮টি এনজিও’র ২২৮টি প্রকল্পের (এফডি-৭) বিপরীতে দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত মোট ৪২৬ কোটি টাকা অনুমোদন ও অর্থ ছাড় করে। এই প্রকল্পগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বল্প মেয়াদি প্রকল্প। এছাড়া কিছু কুইক রেসপন্স প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়। প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে যত বেশি মানুষকে প্রকল্পের আওতায় আনা যায় সেই বিষয়ে বিবেচনা করা হয়েছে। এর বাইরে যেসব প্রকল্প করোনা পরিস্থিতির কারণে অবাস্তবায়িত ছিলো ক্ষেত্রবিশেষে সেগুলো করোনা মোকাবেলায় কাজ করার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে অনুমোদন দেওয়া হয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনায় কিছু অসংগতি ছিলো। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো তদন্ত, যাচাই-বাছাই করে সেগুলো যথাযথভাবে অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৯০% প্রতিষ্ঠান স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি গ্রহণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়নি। ইতিমধ্যে উল্লেখিত হয়েছে যে প্রায় ৩৭ শতাংশ (২৭টি) প্রতিষ্ঠান কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নতুন তহবিলে কাজ করেছে; এর মধ্যে ২৩টি প্রতিষ্ঠান এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে প্রকল্পের অনুমোদনের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়নি। বরং অনেকে অনলাইন অনুমোদন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে একজন এনজিও প্রতিনিধি বলেন,

> *“এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরোর অনলাইন অনুমোদন বেশ কার্যকর ছিল। এফডি-৭ এর একটি অনুমোদন ২৪ ঘন্টার মধ্যে পেয়ে যাই যা ছিল অভাবনীয়।”*

মাঠ পর্যায়ে বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের তদারকি প্রথমদিকে বাধাগ্রস্ত হয়। তবে পরবর্তীতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহায়তা তত্ত্বাবধান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মূলত জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমেই তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

৫.১.২. অন্যান্য তদারকি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

এমআরএ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা, যেমন অফিস জীবানুমুক্ত রাখা, অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখা, করোনাকালীন সময়ে ঋণের কিস্তি আদায়ে চাপ না দেওয়া বা কিস্তি আদায় বন্ধ রাখা, ক্ষুদ্রঋণ ছাড়া অন্যান্য সাক্ষাৎ প্রার্থীদের অফিসে আসা নিরুৎসাহিত করা, করোনাকালীন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত কর্মীদের চাকুরিচ্যুত না করা, সমিতির সভা বা উঠান বৈঠক বন্ধ রাখা, ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেন বাড়ানো ইত্যাদি নির্দেশনা প্রদান করে।

ক্ষুদ্রঋণ সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তির লক্ষ্যে এমআরএ একজন পরিচালক ও আটজন উপপরিচালকের সমন্বয়ে একটি মনিটরিং সেল গঠন করলেও অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তির কোনো নথি সংরক্ষণ করা হয়নি। তবে উপজেলা প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের মধ্যস্থতায় কিছু ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাদের সমস্যাগুলোর সমাধান হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একজন উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন,

“করোনা শুরু দিকে আমার কাছে অনেক মানুষ অভিযোগ করে যে কিস্তির জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে। পরবর্তীতে আমরা সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে কথা বলে বিষয়টি সুরাহা করার চেষ্টা করি।”

অন্যদিকে করোনা উদ্ভূত সংকট মোকাবেলায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পক্ষ থেকে অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধনকৃত ৫৬ হাজার বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাকে প্রতিদিন অন্তত দু'টি পরিবারের নিকট প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার আহবান জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়।[৬২]

৫.১.৩. দাতা সংস্থার ভূমিকা

করোনাকালীন উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় দাতা সংস্থা যে অর্থ প্রদান করেছে তার মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো জুন ২০২১ পর্যন্ত ২২৮টি প্রকল্পের (এফডি-৭) বিপরীতে মোট ৪২৬ কোটি টাকার অনুমোদন ও অর্থ ছাড় করে। জাতিসংঘের সেন্ট্রাল ইমার্জেন্সি রেসপন্স তহবিল (সিইআরএফ) বাংলাদেশে করোনা সংকট মোকাবেলায় সাড়াদানকারী তিনটি জাতীয় (ব্রাক, ফ্রেন্ডশীপ ও রিচিং পিপলস ইন নিড) এবং দু'টি আন্তর্জাতিক সংস্থাকে (সেভ দ্যা চিলড্রেন, ওয়ার্ল্ড ভিশন) প্রায় ২৬ কোটি টাকা অনুদান দেয়। এই অনুদান মূলত বাংলাদেশে আশ্রয়প্রাপ্ত রোহিঙ্গাদের করোনাকালীন স্বাস্থ্যসেবা, পানি, পয়ঃসেবা ও পরিচ্ছনতা সংক্রান্ত কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ ছিল।[৬৩]

কোভিড-১৯ অতিমারিতে সাড়া দিতে এবং ভবিষ্যতের সংকট মোকাবিলায় দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত হতে বাংলাদেশের সরকার বিশ্বব্যাংকের সাথে মোট ১.০৪ বিলিয়ন ডলারের তিনটি অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তি বংলাদেশকে করোনার বিরুদ্ধে টিকাপ্রদান কর্মসূচি ব্যাপক সম্প্রসারণসহ অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করবে। এছাড়া করোনা শনাক্ত, প্রতিরোধ ও এর চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে এই অর্থ ব্যবহার করা হবে।[৬৪]

৫.২. করোনা সংকট মোকাবেলায় বেসরকারি সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়

যে কোনো দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকে জাতিসংঘ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, জি-২০সহ বিভিন্ন সংস্থা সরকারি-বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় এবং সমন্বিত কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। করোনা পরিস্থিতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষকরে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও পাকিস্তানে করোনাভাইরাস শনাক্তকরণের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নমুনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তৃণমূল পর্যায়ে ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্র খোলার কাজে এনজিওদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশেও স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে করোনা পরিস্থিতির শুরুর দিকে (মার্চ-জুন ২০২০) সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। শুরুর দিকে সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সমন্বয়ের কথা বলা হলেও তার বাস্তব উদ্যোগ ছিল অপ্রতুল। বিশেষকরে স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়হীনতা ছিল লক্ষণীয়। কিছু ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলো তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করা, ক্ষেত্রবিশেষে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ব্যস্ততা বা সময় না দেওয়া, উপজেলা পর্যায়ে এনজিও সমন্বয় সভা নিয়মিত না হওয়া, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের সমন্বিত ডাটাবেজ বা ম্যাপ না থাকা ইত্যাদি ছিল সমন্বয়হীনতার কারণ।

করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে সরকারের একজন মন্ত্রী বলেন, *“ঢাকা মেট্রোপলিটন শহরে অবস্থিত বিভিন্ন বস্তিতে করোনাভাইরাসজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য সরকারের পাশাপাশি এনজিও এবং সুশীল সমাজের সম্পৃক্ততা জরুরি।”*[৬৫] এ ক্ষেত্রে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের তত্ত্বাবধানে দশটি করে সাব-কমিটি গঠন ও প্রতিটি কমিটিতে অন্তত একজন এনজিও প্রতিনিধি রাখা এবং কমিটিগুলোর কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু এই কার্যক্রমে বাস্তবায়নেও দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ করা গেছে। একইসাথে বেসরকারি সংস্থাগুলো থেকেও ক্রমাগত সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে। জুলাই অনুষ্ঠিত এসডিজি প্ল্যাটফর্মের একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরাও তাদের কাজে সমন্বয়ের ঘাটতি আছে বলে দাবি করে। এ প্রসঙ্গে একজন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি বলেন,

“করোনা সংকট মোকাবিলায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে সরকারি নীতি-কৌশল ও কর্মপন্থায় যুক্ত করা হয়নি। এ জন্য জাতীয় কৌশল গ্রহণ করতে হবে। কেননা, কোভিড সংকট এক দিনে শেষ হবে না। তিনি বলেন, এসডিজি

---

[৬২] সমাজসেবা অধিদপ্তরে ওয়েবসাইট হতে প্রাপ্ত (২০ আগস্ট ২০২১)।

[৬৩] CERF allocates $3 million to NGOs for the COVID-19 response in Bangladesh, UN RC Bangladesh, 22 July 2020, available at: https://reliefweb.int/report/bangladesh/cerf-allocates-3-million-ngos-covid-19-response-bangladesh [accessed on 6 September 2021]

[৬৪] Press Release, The World Bank, 14 April,2021, available at: Link [accessed on : 2 November 2021]

[৬৫] স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো তাজুল ইসলাম, করোনাভাইরাস মোকাবিলায় এনজিও এবং সুশীল সমাজের সম্পৃক্ততা জরুরি: মন্ত্রী, ইউ.এন.বি নিউজ, এপ্রিল ০৬, ২০২০।

বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ের এনজিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই করোনা সংকটের মতো দুর্যোগকালে টিকে থাকতে এসব এনজিওর জন্য আর্থিক প্রণোদনা বা নীতি সহায়তা কিছুই নেই।" [৬৬]

এছাড়া সাবেক একজন এনজিও প্রতিনিধি বলেন,

"স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়হীনতা ছিল। দেখা গেছে যেখানে আমরা আজকে ত্রাণ দিয়েছি, পরবর্তীতে ঐখানে আরেকটি প্রতিষ্ঠান ত্রাণ দিয়েছে। আবার দূরবর্তী দুর্গম এলাকায় আমরাও যেতে পারি নি। অন্য প্রতিষ্ঠানও ঐখানে যায় নি।"

ক্ষেত্রবিশেষে সরকারের নির্দেশনা প্রতিপালন, স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে করোনা মোকাবেলায় কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রণয়ন ও ঋণ/সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা গেছে। জাতীয় পর্যায়ে তুলনায় স্থানীয় পর্যায়ে এ ধরনের সমন্বয়হীনতা ছিল বেশি। কিছু কিছু এলাকায় সরকারের স্থানীয় পর্যায়ে তদারকি প্রতিষ্ঠান যেমন সমাজসেবা অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং সর্বোপরি উপজেলা প্রশাসনের সাথে স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করা বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান বিশেষকরে উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমাজসেবা অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে বেসরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বয়েরও প্রভাব পড়ে।

স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় বেশ কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ত্রাণের তালিকা প্রণয়নে অনিয়ম ও ভুল-ভ্রান্তি, ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে অনিয়ম, সরকারি সাহায্য বিতরণের ক্ষেত্রে অনিয়ম ইত্যাদি। গবেষণায় দেখা গেছে কিছু কিছু এলাকায় বেসরকারি সংস্থা, সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে একই ব্যাক্তির নাম একাধিকবার তালিকায় এসেছে। ক্ষেত্রবিশেষে নামের তালিকা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের আত্মীয় স্বজনের নাম অন্তর্ভুক্ত করাসহ অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। কিছু কিছু এলাকায় জনপ্রিতিনিধিদের কাছে ত্রাণের সামগ্রী পাওয়া গেছে। এছাড়া একই ব্যক্তি একাধিকবার সাহায্য পাওয়া এবং ক্ষেত্রবিশেষে সাহায্য পাওয়ার উপযোগীদের সাহায্য না পাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ বলেছেন যে তারা সাহায্য পাওয়ার উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও কোনো বেসরকারি সংস্থা থেকে সাহায্য পান নি।

এ ছাড়া ত্রাণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুসারে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও উপজেলায় স্বচ্ছতা কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়।এসব কমিটিতে স্থানীয় নাগরিক, এনজিও প্রতিনিধি, রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার কথা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এই ধরনের কমিটি গঠনে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষদের খুব কমই সম্পৃক্ত করা হয়। এই কমিটিতে স্থানীয় বেসরকারি সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম ছিলো। গবেষণা অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে মাত্র ২৮ শতাংশ প্রতিষ্ঠান স্বচ্ছতা নিশ্চিত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৭২ শতাংশ প্রতিষ্ঠান কোনো স্বচ্ছতা নিশ্চিত কমিটির সদস্য নয়। স্বচ্ছতা নিশ্চিত কমিটিতে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং এনজিও প্রতিনিধির প্রতিনিধিত্ব কম থাকায় বিভিন্ন জায়গা দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। দেশের প্রায় ৫০ এর অধিক জনপ্রতিনিধি সরকারি ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া সরাসরি মানুষের মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্টে টাকা দেয়ার ক্ষেত্রে অশিক্ষিত, অসহায় গরীব মানুষের মোবাইল নম্বরের জায়গায় জনপ্রতিনিধি ও তাঁদের আত্মীয়স্বজনের নম্বর দিয়ে রাখার অভিযোগ রয়েছে। ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে তালিকা তৈরিতে অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের অভিযোগ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ গণমাধ্যমে উঠে এসেছে।

তবে পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধি, ত্রাণের তালিকা প্রণয়ণ, ত্রাণ বিতরণ, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, করোনায় মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন ও সৎকারসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে সরকারের অংশীজন হিসেবে বেসরকারি সংস্থাগুলো কাজ করে। ত্রাণ সরবরাহে সমন্বয়হীনতার এড়ানোর জন্য ব্র্যাক আরবান স্লাম ম্যাপ প্রণয়ন করে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৬৮ শতাংশ বেসরকারি সংস্থা বলেছে তারা সরকারের অংশীজন হিসেবে বিভিন্ন ধরনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

[৬৬] দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, *প্রথম আলো*, 'মাঠপর্যায়ের ৯০% এনজিও আর্থিক সংকটে', ৯ জুলাই ২০২০।

৬. ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.১. উপসংহার

করোনা সংকট বিশ্বের অধিকাংশ দেশের ন্যায় বাংলাদেশের বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা এবং সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে এক অভূতপূর্ব সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। বেসরকারি সংস্থাগুলোও এর ব্যতিক্রম ছিল না। দাতা সংস্থা কর্তৃক তহবিল হ্রাসের কারণে এনজিওগুলো এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বিভিন্ন মেয়াদে বন্ধ থাকায় ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো তহবিল সংকটে পড়ে। বড় পরিসরে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং কর্মসূচি চলমান রাখার ক্ষেত্রেও এই তহবিল সংকট বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। তহবিল সংকটের ফলে অনেক প্রতিষ্ঠানকে তাদের কর্মীদের বেতন ভাতা কমাতে হয় বা কর্মী ছাঁটাই করতে হয়। এছাড়া এনজিওগুলো সাধারণত বিভিন্ন প্রকল্পভিত্তিক অর্থ গ্রহণ করে থাকে। প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রমের বাইরে সেই তহবিল থেকে অর্থ ব্যয় করা অনেক সময় দুরূহ হয়ে পড়ে। এতদসত্ত্বেও কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নতুন তহবিল ও চলমান প্রকল্পের তহবিল ছাড়াও করোনা সংকটে সাড়াদানকারী সংস্থাগুলোর একটি বড় অংশ তাদের সাধারণ ও চলমান প্রকল্পের তহবিল থেকে ব্যয় নির্বাহ করে ত্রাণ ও খাদ্য সহায়তা, নগদ অর্থ বিতরণ, করোনা সংক্রান্ত সচেতনতামূলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্যসেবা ও সুরক্ষাসামগ্রী প্রদানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে। করোনার সময়ে করোনা আক্রান্ত মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন বা সৎকার একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। করোনা আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে অনেক মৃত ব্যক্তির স্বজন কর্তৃক হাসপাতালে লাশ ফেলে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। এ সময়ে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

এছাড়াও করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিষয়ক গবেষণার পাশাপাশি পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা ও দ্রুততার সাথে সেগুলোর ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলো অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী করোনা সংক্রমণের ফলে কাজ বন্ধ থাকায় রেমিটেন্স পাঠাতে না পারা, অভিবাসী প্রত্যাশীদের এবং ছুটিতে থাকা অভিবাসীদের কর্মক্ষেত্রে ফিরতে না পারা, গন্তব্য রাষ্ট্রগুলোর ঢালাওভাবে শ্রমিকদের দেশে পাঠিয়ে দেয়াসহ অভিবাসীরা বিভিন্ন সংকটের সম্মুখীন হয়। এ সময় কয়েকটি সংস্থা তাদের পাশে দাঁড়ায়।

তহবিল সংকট ছাড়াও সংস্থাগুলো কর্মসূচি বাস্তবায়ন যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়ন, দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছানো, কর্মসূচি বাস্তবায়নে সচেষ্ট অংশের মধ্যে সমন্বয়হীনতা উল্লেখযোগ্য। তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপযোগী না হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের প্রভাবের কারণে অনেককে উপকারভোগীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং কিছুক্ষেত্রে তালিকা প্রণয়নে স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপের অভিযোগ রয়েছে।

তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয়ে প্রতিষ্ঠানেগুলোর বিপক্ষে উল্লেখযোগ্য কোনো অনিয়ম পাওয়া যায়নি। তবে উপকারভোগীর একাংশের কাছ থেকে তালিকা প্রণয়নে স্বজনপ্রীতি, তালিকা ওভারলেপিং হওয়া, তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য তদবির করার মত কিছু অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়। স্বল্প সংখ্যক উপকারভোগী সংশ্লিষ্ট সংস্থাতে অভিযোগ দায়ের করলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এছাড়া অধিকাংশ সংস্থারই স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে ঋণগ্রহীতাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ঋণের কিস্তি পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনিয়মের শিকার হয়েছিলেন।

তদারকি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে বিভিন্ন প্রকল্পের অনুমোদন ও অর্থ ছাড় ত্বরান্বিত করতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনলাইন অনুমোদন ব্যবস্থা বেশ কার্যকর ছিল। এমআরএ ক্ষুদ্রঋণ সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি মনিটরিং সেল গঠন করলেও অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির কোনো নথি সংরক্ষণ করা হয়নি। দাতা সংস্থাগুলো কোনো ক্ষেত্রে চলমান প্রকল্প থেকে তহবিল কর্তন করেছে আবার কোনো ক্ষেত্রে সংকট মোকাবেলায় নতুন তহবিল প্রদান করেছে। তবে নতুন তহবিল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পৃক্ততা কম ছিল।

বেসরকারি সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করা, ক্ষেত্রবিশেষে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ব্যস্ততা বা সময় না দেওয়া, উপজেলা পর্যায়ে এনজিও সমন্বয় সভা নিয়মিত না হওয়া, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের সমন্বিত ডাটাবেজ বা ম্যাপ না থাকা ইত্যাদি কারণেই প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা গেছে। তবে পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬.২. সুপারিশঃ

করোনা ভাইরাসের মতো দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যকর অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য এই গবেষণার ফলাফলের আলোকে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো।

১. করোনাকালে তৃণমূল পর্যায়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রমের (সচেতনতা বৃদ্ধি, খাদ্য সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা, নগদ অর্থ সহায়তা এবং ত্রাণ তৎপরতা) ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং সমন্বয় সাধন করতে হবে।

২. বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক করোনাকালীন গৃহীত কর্মসূচির ধরন, আওতা, ব্যয়, উপকারভোগীর তথ্য ইত্যাদি স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ ও নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে।

৩. করোনাকালীন মাঠ পর্যায়ে বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম বিশেষত উপকারভোগীদের ত্রাণ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে তদারকি সংস্থা কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

৪. কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা নিরসনে তদারকি সংস্থা কর্তৃক উপকারভোগীদের তথ্য সংবলিত একটি সমন্বিত ডাটাবেজ ও ডিজিটাল ম্যাপ তৈরি করতে হবে।

৫. যেকোনো দুর্যোগ পরিস্থিতি সফলভাবে মোকাবেলায় সরকারকে শুরু থেকেই কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সকল এনজিও নেটওয়ার্ক/প্ল্যাটফর্মকে সাথে নিয়ে একটি যৌথ সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৬. করোনা সংকট মোকাবেলায় দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরকার ও দাতা সংস্থাগুলোর কর্মপরিকল্পনায় স্থানীয় পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে এবং কর্মসূচিতে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জীবিকায়ন ও সামাজিক সুরক্ষা খাতের আওতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৭. বিভিন্ন দুর্যোগে বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক সাড়াপ্রদান কার্যক্রম পরিচালনের জন্য সরকার কর্তৃক এবং দাতা সংস্থা কর্তৃক দুটি ভিন্ন তহবিল গঠন করতে হবে।

৮. বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বিবেচনায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশেষকরে টিকা নিবন্ধন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

৯. আর্থিক ঝুঁকিতে পড়া স্থানীয় পর্যায়ের সংস্থাগুলোকে টিকে থাকার জন্য সরকার ও দাতা সংস্থা কর্তৃক নীতি সহায়তা ও আর্থিক প্রণোদনা দিতে হবে।

১০. ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে করোনাকালীন সংকট মোকাবেলায় সহজ শর্তে, স্বল্প সময়ে, কম সুদে ঋণ প্রাপ্তির ধারাবাহিকতার পাশাপাশি ঋণগ্রহীতা সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বাজারজাতকরণের সুবিধা প্রদান করতে হবে।